দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ৭ম সংখ্যা ❖ ১৭ আগস্ট ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার হরণ নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির অশুভ আঁতাত ! ২
- আদালতের ইঙ্গিত, কমিশনের নীরবতা ৩
- বরাক উপত্যকার নাগরিক সমাজের আবেদন ভাষা ও জাতিসত্তার উপর আক্রমণ মানব না ৫
- মেয়েদের দুয়ারে সরকার ৬
- ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫- অযৌক্তিক ও অন্যায্য ৯
- মোদিজীর আমলে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তলানিতে এসে ঠেকেছে ১২
- চাকরি থেকে কর্মসংস্থান ১৩
- কাশ্মীরে অরুন্ধতী রায় ও এ জি নুরানীর বই নিষিদ্ধ : মুক্ত চিন্তার ওপর আক্রমণ ১৬
- শতবর্ষে সুকান্ত -- কবি সুকান্ত যার কলম কাঁদত শোষিতদের জন্য ১৭
- বিশ্বকবির তিরোধানের দিন শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ দিবস ১৮
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও এখন বাংলাদেশ ১৯
- জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান ২২
- বিচারপতিদের প্রমাণ করতে হবে তাঁদের দায়িত্ব জনতাকে ন্যায় দেওয়া, দলদাস হওয়া নয় ২৩
- শ্রদ্ধাঞ্জলি -- শিবু সোরেন ২৫ রজত কান্ত রায় ২৫
- অভয়ার হত্যাকাণ্ডের পর এক বছর বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে ২৬

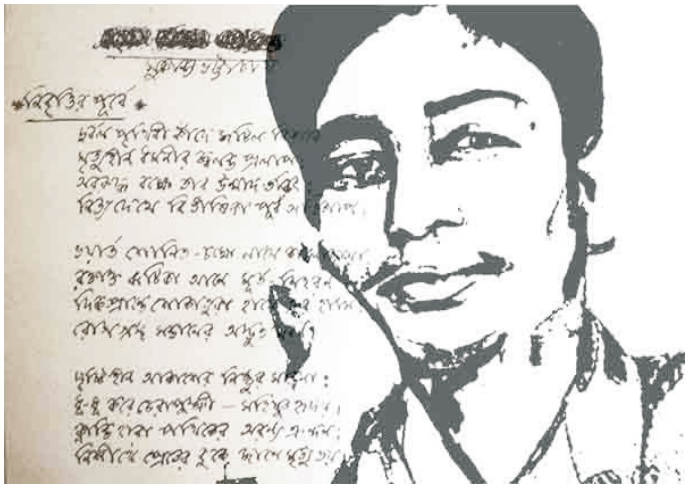

➲সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা ও সংবিধান আজ আক্রমণের সম্মুখীন
সর্বশক্তি দিয়ে তা রক্ষা করতে হবে

দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ এর বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে জাতীয় কর্তব্যটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্পন্ন করে তা হচ্ছে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়ন। ভারতের সংবিধান প্রণয়ন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলশ্রুতি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দেশের জনসাধারণের স্বেচ্ছামূলক মিলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। ভারতের সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত গণ পরিষদ। স্বাধীনতার অব্যবহিত আগেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে গণ পরিষদ সংবিধান রচনার কাজ শুরু করে। মুসলিম লীগ এই কাজে বাধা দেয় ও গণ পরিষদ বয়কট করে । পন্ডিত নেহরু তাঁর ১৯৪৬-এর ১৩ ডিসেম্বরের বক্তৃতায় সংবিধানের লক্ষ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই বক্তৃতায় ভারতকে 'স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয়। ভারতের নাগরিকদের আইন ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের , সমমর্যাদা লাভের , সমান সুযোগ - সুবিধার , আইনের সমবিচারের, চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশের, ধ্যানধারণা আর ধর্মবিশ্বাসের, উপাসনার, ইচ্ছামতো কাজ করার, মেলামেশা করার ও সক্রিয় হওয়ার স্বাধীনতার দৃঢ় আশ্বাস দেওয়া হয়।

একই সঙ্গে এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে, 'সংখ্যালঘুদের, পিছিয়ে পড়া ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের , অবনত ও অনুন্নত শ্রেণির মানুষদের জন্য যথোপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হবে। পণ্ডিত নেহরু এই বক্তব্য পেশ করার সময় মহাত্মা গান্ধির অনুপ্রেরণার কথা পর স্মরণ করেন। তিনি ভারতের গৌরবময় অতীত স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ফরাসি, মার্কিন ও রুশ বিপ্লবের কথাও স্মরণ করেন। মহাত্মা গান্ধির অভিপ্রায় ছিল স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে বসবেন একজন অস্পৃশ্যা নারী। তাঁর সে অভিথায় পূর্ণ না হলেও অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত ড. বি আর আম্বেদকরকে সংবিধান রচনা কমিটির সভাপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। কংগ্রেস দল এই উদারতা প্রদর্শন করেছিল একজন সুযোগ্য ব্যক্তির প্রতি। যদিও ড. আম্বেদকর ছিলেন তীব্র কংগ্রেস বিরোধী এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি কখনও অংশগ্রহণ করেননি। সংবিধান প্রণয়নের সময় হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রবলভাবে বাধা দেয় । তারা ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণের বিরোধিতা করে ।

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সর্বজনমান্য ইতিহাস লিখেছেন গ্রানভিল অস্টিন। তাঁর মতে, ৩৯৫টি ধারা এবং ৮টি তপশিল সমন্বিত ভারতীয় সংবিধান সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ সংবিধান। তাঁর মতে, '১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়াতে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল তার পর থেকে ভারতের সংবিধান রচনার কাজটিই ছিল বৃহত্তম।' নব সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে কার্যকর করা হয়। এই দিনটি বেছে নেওয়ার একটি প্রেক্ষাপট আছে। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশন থেকে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরবর্তী বছর থেকে ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্বাধীনতা দিবস পালন করার জন্যই দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানানো হয়। পরাধীন ভারতে এই তারিখেই পরবর্তী বছরগুলিতে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হত। নব সংবিধান তাই ওই তারিখ থেকেই কার্যকর করা হয়।

সংবিধান প্রণয়নের কাজ যখন চলছিল তখন হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করে। সদ্য স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রকে এই শক্তি প্রথম থেকেই এইভাবে আক্রমণ শুরু করে। আর এখন তাদের মূল লক্ষ্য ভিতর থেকে এই সংবিধানকে ধ্বংস করা। এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করাই এখন দেশপ্রেমিক শক্তির মূল কর্তব্য।

সম্পাদক
শান্তনু দত্ত চৌধুরী
সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।
ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ●ফোন : 80178 04019 / 94340 22512 ● ওয়েবসাইট : nagorik.co.in

নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার হরণ নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির অশুভ আঁতাত !

শুভাশিস মজুমদার

বিজেপির প্রতি জনসমর্থনে যে ধ্বস নেমেছে তা' বিগত লোকসভা নির্বাচনী ফলে স্পষ্ট হয়ে যায়।

চারশো পারের স্লোগান তুলে ভোটে যাওয়ার পরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি গতবারের জেতা ৩০০ আসনের থেকে বহু আসন খুইয়ে ২৪০ আসনে জিতে, নীতিশ কুমারের জেডিউ ও চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টির সমর্থনে, কোনোক্রমে সরকার গঠন করে। অপর দিকে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস ১০০ টি আসন জিতে নিয়েছে যা গতবারের ৪০ আসনের থেকে অনেক বেশি। বিজেপি মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে খুবই খারাপ ফল করে

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বা বিজেপি-বিরোধী দলগুলির প্রতি ব্যাপক সমর্থন লক্ষ্য করা গেলেও আশ্চর্যজনক ভাবে বিজেপির পক্ষে ফলাফল যায়। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এর অন্যতম উদাহরণ।

নির্বাচনে দুর্নীতি ও বিজেপির প্রতি নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্বের একের পর এক অভিযোগ উঠতে থাকে। নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি এক ভাষাতেই বিভিন্ন অভিযোগ খন্ডন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আদালত ও বিচার ব্যবস্থার কাছেও এই নিয়ে নানা বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তাড়াহুড়ো করে নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-কে কেন্দ্র করে নানা অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন কমিশন জেরবার হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশন প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটার কে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশের পরেও আধার কার্ড, এপিক বা রেশন কার্ড প্রভৃতিকে ভোটার হওয়ার নথি হিসেবে নির্বাচন কমিশন গ্রাহ্য করছে না। অভিযোগ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম ও অনগ্রসর সমাজের মানুষ এর শিকার হয়েছেন, যাঁরা সাধারণ ভাবে বিজেপি-বিরোধী ভোটার হিসেবে পরিচিত। বিজেপি নেতারা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ নিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজেপির বিজয় কুমার সিনহার নাম দুটি জেলার ভোটার তালিকায় রয়েছে।

এরই মধ্যে ৭ আগস্ট বিশাল প্রেস কনফারেন্স করে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রধান বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি তথ্য-প্রমাণ সহযোগে এক ছয় মাস ধরে চালানো নিবিড় গবেষণা ও বিশ্লেষণ লব্ধ ফলাফল তুলে ধরেছেন। যাতে নির্বাচন কমিশন কিভাবে কৌশলে বিজেপির পক্ষে কাজ করে বেশ কিছু আসনে বিজেপির জয়লাভে সাহায্য করেছে তার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। ৮ আগস্ট কর্ণাটকে এক জনসভায় ভারতের নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই অন্য পর্যায়ে তুলে দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এইদিন কংগ্রেসশাসিত কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে তিনি রাজ্য সরকারকে ভোট চুরি তদন্তের জন্য বলেন। আগের দিন দুপুরে প্রথমে দলীয় সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) 'ভোট চুরির রহস্য' তুলে ধরেন রাহুল। এরপর নিজের বাসভবনে 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতাদের নৈশভোজের আসরেও তিনি ইসি,বিজেপি 'আঁতাতের' চরিত্র উন্মোচন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াকে রাহুল বলেন, বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা আসনের অন্তর্গত মহাদেবপুরা বিধানসভা আসনে ইসির কর্তাদের ভোট চুরির তদন্ত করা হোক। অপরাধীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। তাঁদের চিহ্নিত করা হোক, যাতে সত্য প্রকাশিত হয়। ইসির দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ ও তদন্ত করে রাহুল প্রমাণ করতে চেয়েছেন, শুধু মহাদেবপুরা বিধানসভা আসনের ভোটার তালিকায় কারচুপি করে বিজেপি বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসকে হারিয়েছে।

বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা আসনের অন্তর্গত মোট সাতটি বিধানসভা আসন রয়েছে। সেগুলোর ছয়টি বিধানসভায় কংগ্রেস জিতলেও মহাদেবপুরায় বিজেপি এক লাখের বেশি ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। সে কারণে বিজেপি লোকসভা আসনটি ৩২ হাজার ভোটে জিতে যায়। রাহুল দেখিয়েছেন এই এক লাখের বেশি ভোট বিজেপি পেয়েছে কারচুপির মাধ্যমে।পাঁচ উপায়ে ইসি এ কাজটা করেছে বলে রাহুলের দাবি। ইসির কাছ থেকে পাওয়া মহাদেবপুরা বিধানসভা আসনের দিস্তা দিস্তা ভোটার তালিকা (যা পরপর সাজালে উচ্চতা দাঁড়ায় সাড়ে সাত ফুট) খুঁটিয়ে দেখে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঠিকানা ধরে ধরে তদন্ত করে রাহুল ওই পাঁচ উপায়ের খোঁজ পেয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শুধু ওই বিধানসভা আসনে ডুপ্লিকেট ভোটারের (যে নাম একাধিক বুথে রয়েছে) সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৯৬৫, ভুয়া ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার, একই ঠিকানায় একাধিক পরিবারের ভোটারসংখ্যা ১০ হাজার ৪৫২। দেখা যাচ্ছে, কর্ণাটকে এক বিজেপি নেতার একটি এক কামরা ঘরের ঠিকানায় ৮০ জন ভোটারের নাম নথিভুক্ত। ভোটার তালিকায় ভুল ছবি বা ছবি না থাকার সংখ্যা ৪ হাজার ১৩২ এবং ফরম,৬,এর অপব্যবহার করেছেন ৩৩ হাজার ৬৯২ জন।

ফরম,৬ দেওয়া হয় প্রথমবার যাঁরা ভোট দিচ্ছেন তাঁদের। অর্থাৎ যে ভোটারদের বয়স ১৮ বা এর কিছু বেশি। রাহুল দেখিয়েছেন, মহাদেবপুরায় ফরম,৬,এ ৩৩ হাজার ৬৯২ জনের বয়স ৬০ থেকে ৯২ বছর ! রাহুল বলেন, তাঁর দলের এই কাজ করতে সময় লেগেছে ছয় মাস। ইসি যদি ডিজিটাল তথ্য দিত, তাহলে এই কাজ করতে কয়েক ঘণ্টাই যথেষ্ট ছিল।

রাহুল বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ২৫ টি আসনে বিজেপি মাত্র ৩০-৩২ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এই আসন গুলিতে বিজেপির জয় সন্দেহজনক। বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভার ঘটনা একটি উদাহরণ মাত্র।

কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, বিজেপির হয়ে ইসি কারচুপি না করলে ২০২৪ সালের ভোটে কর্ণাটকের ২৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৬টিতে জিততই। তথ্যসহকারে এই ভোট চুরির প্রমাণ দিয়ে রাহুল অভিযোগ করেন, ইসি এই কারসাজি না করলে নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না।

রাহুল বলেন, ইসি কিছুতেই ডিজিটাল ভোটার তালিকা দিতে চাইছে না। গত ১০ বছরের ভোটের ভিডিওগ্রাফির রেকর্ডও প্রকাশ করতে চাইছে না। সামান্য পেনড্রাইভে বছরের পর বছর বিপুল তথ্যভান্ডার সংরক্ষিত রাখা যায়। ইসি তা জেনেও ৪৫ দিন পর তথ্য মুছে ফেলতে চাইছে। তা করতে চাইছে যাতে চুরি ধরা না পড়ে।

রাহুল গান্ধি বলেন, ইসি প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক ডেটা তুলে দিলেই প্রমাণ করে দেবেন, কীভাবে ভোট চুরি করে তারা মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করেছে।

কংগ্রেস নেতা বলেন, (ইউপিএ) সরকার আইন করে মানুষকে তথ্য জানার অধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষ যখন তথ্য জানতে চাইছে, ইসি তখন তাদের ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিচ্ছে। তারা রাজস্থান ও বিহারে তাদের ওয়েবসাইট বন্ধ রেখেছে। রাহুল হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এই ভোট চুরি সংবিধানের অপমান। সময় বদলাবে। অপরাধীদের একজনও পার পাবেন না।

রাহুল বলেন, ঠিক এভাবে কারচুপি করে মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভোটে ইসি বিজেপি ও তার দোসরদের জিতিয়েছে। নইলে মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে ওই বিপুল পরিবর্তন হতো না। লোকসভা ভোটের পাঁচ মাস পর মহারাষ্ট্রে বিধানসভার ভোট হয়। ইসির বদান্যতায় পাঁচ মাসে ভোটার বৃদ্ধি পায় ৪০ লাখ। বিজেপি ও তার শরিকেরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়।

আজ রাহুল মধ্য প্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরাখন্ড বিধানসভার ভোটেও ইসির কাপচুপির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিহারে ভোটার তালিকার যে নিবিড় সংশোধনের কাজ চলছে, তার লক্ষ্যও বিজেপিকে জেতানো। সেটা তারা করতে চাইছে বিপুল ন্যায্য ভোটারের নাম কেটে ও ভুয়া ভোটার ঢুকিয়ে। তাঁর অভিযোগ, সাধারণ দরিদ্র, অনগ্রসর মানুষই হতে চলেছেন এই ভোট চুরির শিকার।

ইসি থেকে রাহুলকে বলা হয়, হয় শপথ নিয়ে অভিযোগ জমা দিন, নয়তো জনগণের কাছে ক্ষমা চান। রাহুল ইসিকে জানিয়ে দিয়েছেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রকাশ্যে যা বলেছেন, যে অভিযোগ এনেছেন সেটাই তাঁর ঘোষণাপত্র। সংবিধানের শপথ নিয়ে সংসদের সদস্য হয়েছেন। ইসির এত শর্ত দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই।

প্রাক্তন প্রধান ইলেকশন কমিশনার ও পি রাওয়াত বলেছেন, রাহুল গান্ধির পক্ষ থেকে অফিসিয়াল অভিযোগ বা হলফনামার জন্য অপেক্ষা না করে ইলেকশন কমিশনের নিজে থেকেই এই অভিযোগের তদন্ত শুরু করে দেওয়া উচিত। কারণ, অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। তাছাড়া যে আইন অনুযায়ী ইসি রাহুলের কাছে হলফনামা চেয়েছে, তা' এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইলেকশন কমিশন, নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রধানমন্ত্রী , স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চূড়ান্ত ভাবে লঙ্ঘন করলেও নিশ্চুপ থাকে। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে গোটা নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী গোটা দেশে বলে বেড়ালেন , কংগ্রেস নির্বাচনে জিতলে অর্থনৈতিক সমীক্ষা করে হিন্দুদের সম্পত্তি নিয়ে নেবে ও মুসলমানদের দিয়ে দেবে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস হিন্দু মহিলাদের মঙ্গলসূত্র কেড়ে নিয়ে তার সোনা মুসলমানদের দেবে। আর অমিত শাহ প্রচার করলেন তাঁরা এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩ কোটি উই পোকা ও ছার পোকা (অর্থাৎ বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশ কারি) উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবেন। এই ভাবে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে নির্বাচনী প্রচার করা সত্ত্বেও এই নির্বাচন কমিশন নিশ্চুপ হয়ে থেকেছে।

ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া জোটের সব দল রাহুল গান্ধির পাশে এসে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ১১ আগস্ট দিল্লিতে সংসদ চত্বর থেকে দু' কিলোমিটার দূরের ইলেকশন কমিশনের অফিস অভিযানে সামিল হয়ে গ্রেফতার হন রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি।

এইভাবে সংবিধান ধ্বংস করার ও মানুষের অধিকার হরণ করার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাগরিকদের তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে।

বিচার ব্যবস্থারও এই ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা কাম্য।

আদালতের ইঙ্গিত, কমিশনের নীরবতা

সঞ্জয় হেগড়ে

বিহারের নির্বাচনী তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নাগরিক, সুশীল সমাজ এবং সংসদের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট ; সর্বজনীন ভোটাধিকারকে 'সতর্কতা'র নামে বাতিল করা যায় না।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন করে করে কথা বলে। কখনো নরম, কখনো তীক্ষ্ণ। বিহারে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে শুনানির সময়, আদালত অনেকেরই মনে থাকা এক প্রশ্ন তুলেছে হঠাৎ নতুন নথির প্রয়োজন হল কেন? এখনই কেন? এবং যারা এই শর্ত পূরণ করতে পারবে না, তাদের কী হবে? তার পরেও কমিশনের কাছ থেকে এমন একটি উত্তর পাওয়া গেছে যা মূল উদ্বেগের কোনো সমাধান দেয়নি। ইসিআই জোর দিয়ে বলছে এ একটা প্রযুক্তিগত সংশোধন।

কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষার বাস্তব এবং এর নীতির প্রভাব এক সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্প বলছে। বিহারের এসআইআর প্রতিটি ভোটারকে এক মাসের মধ্যে নাগরিকত্বের নতুন প্রমাণ জমা দিতে বাধ্য করছে ; না হলে তাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে, যার ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো নির্ভুলতা (স্বচ্ছতা?)। কিন্তু ফলাফল হলো বর্জন (অভিসন্ধিমূলকভাবে?)। এ কোনো প্রশাসনিক রক্ষণাবেক্ষণ নয়। এ হল নাগরিকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এক আদর্শগত পরিবর্তন অনুমিত অন্তর্ভুক্তি থেকে অনুমিত বর্জনের দিকে। এই পরিবর্তন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গভীরভাবে বিচ্যুত।

সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া

যখন ভারত একটা প্রজাতন্ত্র হয়েছিল, তখন সে এক র‍্যাডিকাল পদক্ষেপ নিয়েছিল সাক্ষরতা, আর্থিক রোজগার এবং জাতি বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার দিয়েছিল। সংবিধান সভায় এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল। অনেক সদস্য সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে দেশ এর জন্য প্রস্তুত কিনা। কিন্তু ড. বি. আর. আম্বেদকর, আরও অন্যান্যরা সহ, জোর দিয়েছিলেন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক সমতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এই নীতি বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি), সুকুমার সেন (২১ মার্চ, ১৯৫০ - ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৮)। ১৭৩ মিলিয়ন সম্ভাব্য ভোটারের মুখোমুখি হন তিনি, যাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু তিনি উদ্ভাবনের রাস্তায় হেঁটেছিলেন। তিনি ভোটের প্রতীক চালু করেছিলেন এবং প্রক্রিয়াগুলো এমনভাবে ডিজাইন করেছিলেন যাতে অংশগ্রহণ সহজ হয়, দুরূহ নয়। ভারতের প্রথম নির্বাচন নিখুঁত ছিল না ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক। বিপরীতে, ভারতের ২৬তম সিইসি, জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারের এই সংশোধন তার ঠিক বিপরীত। জন্ম সনদ এবং পাসপোর্টের মতো বিরল নথির দাবি করে ; যা জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশের কাছে রয়েছে,--ইসিআই এমন একটি মানদণ্ড খাড়া করছে যা লক্ষ লক্ষ মানুষ পার হতে পারবে না। আধার কার্ড এবং রেশন কার্ড, যা দরিদ্রদের কাছে ব্যাপকভাবে রয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। বিহারে এখন ৬৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ ভোটাধিকার হারানোর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এবং

এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমরা আসামে একই ধরনের কার্যক্রম দেখেছি। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা লুঙ্গি-পরা, বাংলা-ভাষী মুসলিম বাসিন্দাদের ডি-ভোটারদ (সন্দেহজনক ভোটার) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছিল, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছিল। অনেকে বিদেশী ট্রাইব্যুনালের সামনে নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে প্রতিকূল আমলাতন্ত্রের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদের প্রকৃতই কোনো সুযোগ ছিল না। ট্রাইব্যুনাল তাদের বিদেশী ঘোষণা করলে এবং কোনো দেশ তাদের গ্রহণ না করলে, অনেককে ভারতের সীমানা পেরিয়ে অবাঞ্ছিত মানব বর্জ্য হিসেবে বলপূর্বক ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর এখন বিহারে ঘটতে চলেছে এই ভুল(অন্যায্যতা?)-এর পুনরাবৃত্তি। এই রাজ্যটি দরিদ্র, বন্যাপ্রবণ এবং অবকাঠামোগতভাবে দুর্বল। বর্ষাকালে নির্দিষ্ট কিছু নির্ধারক নথির কঠোর সময়সীমা এখানে শুধুই দুর্বল পরিকল্পনা নয়। এ হল, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, দরিদ্র এবং প্রান্তিকদের জন্য ভোটের বাক্স অবধি পৌঁছানোর এক অন্তরায়। এবং প্রমাণের দায়িত্ব এখন উল্টো পক্ষের ঘাড়ে। নাগরিকদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা এই দেশের লোক, রাষ্ট্রকে তাদের বেনাগরিক প্রমাণ করবার দায় নিতে হবে না। এই বদল নেহাতই কৃৎকৌশলগত মনে হতে পারে, কিন্তু এর নৈতিক এবং গণতান্ত্রিক মূল্য অপরিমেয়।

ঐতিহাসিক শিক্ষা এবং সতর্কতা

এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিম ক্রো যুগের (১৯শ শতাধীর শেষ থেকে ২০শ শতাধীর মাঝামাঝি পর্যন্ত) বিরক্তিকর প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, যেখানে আফ্রিকান-আমেরিকান ভোটারদের সাক্ষরতা পরীক্ষা, ভোট কর এবং প্রশাসনিক বাধার মাধ্যমে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বাহ্যিকভাবে এটি ছিল আইনি; উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। রেনল্ডস বনাম সিমস (১৯৬৪) এবং ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট ১৯৬৫-এর মতো ল্যান্ডমার্ক রায় এবং ফেডারেল হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভোটের অধিকারকে সত্যিকারের সর্বজনীন অধিকার হিসেবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

ভারতে একই ধরনের আইনি সুরক্ষা রয়েছে। মো. রহিম আলী বনাম আসাম রাজ্য (২০২৪) এবং লাল বাবু হুসেন বনাম নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা (১৯৯৫) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় স্পষ্ট করেছে যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া ভোটাধিকার বাতিল করা অসাংবিধানিক। নাগরিকত্ব স্বেচ্ছাচারীভাবে বাতিল বা অস্বীকার করা যায় না। তবুও, আমরা আবার এই পরিস্থিতির মুখোমুখি ; সমাজের দুর্বলতমদের এমন একটি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছে যা তাদের বিরুদ্ধে সাজানো। শুনানির সময় আদালত ইসিআই-এর ক্রিয়াকলাপের মানবিক পরিণতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু ইসিআই অত্যন্ত প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া রেখেছে, সহানুভূতিসঞ্জাত নয়। সে সময়সীমা এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে জোর দিয়ে চলেছে, সামাজিক বাস্তবতার সমাধান করার কথা ভাবছেই না।

ইসিআই-এর সাংবিধানিক দায়িত্ব কেবল পরিচ্ছন্ন তালিকা বজায় রাখা নয়। তার এ-ও নিশ্চিত করার কথা যাতে মুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন হতে পারে। এর অর্থ ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম করা ; তাতে বাধা সৃষ্টি নয়। এ ক্ষেত্রে ইসিআই ব্যর্থ হচ্ছে। এবং আদালত, যদিও সতর্ক রয়েছে (বলে মনে হচ্ছে), তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সে কেবল ইঙ্গিত দেবে না নির্দেশ দেবে। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার হারানোর মুখে, তখন নরম সতর্কতা যথেষ্ট নয়।

যদি এটি অপরীক্ষিতভাবে চলতে থাকে, আমরা এক বিপজ্জনক অঞ্চলে প্রবেশ করছি। ভোটাধিকার হয়ে উঠতে পারে নথিভুক্ত

মধ্যবিত্তের ; শহুরে, বেতনভোগী, প্রযুক্তি-সক্ষম ; একটি বিশেষাধিকার, যখন দরিদ্র, বাস্তুচ্যুত এবং নথিহীনরা পিছনে পড়ে থাকবে। আমরা দুটো ভারত তৈরির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছি একটায় ভোটাধিকার থাকবে আর অন্যটায় থাকবে না। রাজনৈতিক দলগুলো তখন কেবল তাদের জন্য কাজ করবে যাদের অংশগ্রহণ গোনা যায় ; আক্ষরিক অর্থে। যাদের ভোট নেই, তারা নীতি নির্ধারণ, কল্যাণ এবং ন্যায়বিচারে উপেক্ষিত হবে। আমরা এখানে কেবল ভোটার তালিকার কথা বলছি না। আমরা ক্ষমতার কথা বলছি ; কে সেটা পায়। কে ধরে রাখে। এবং কে সেখান থেকে বাদ পড়ে।

একটি নীরব জরুরি অবস্থা

রাস্তায় ট্যাঙ্ক না নামিয়েও জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্ভব। এক নীরব জরুরি অবস্থার ভিতরেই ইতিমধ্যে আমাদের দেশ, যা জারি হয়েছে অনুপস্থিত নাম, পার হয়ে যাওয়া সময়সীমা এবং জবাব না পাওয়া প্রশ্নের মাধ্যমে। যখন রাষ্ট্রীয় যন্ত্রপাতি নাগরিকত্বকে অধিকার হিসেবে নয়, এক অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করছে। এই মুহূর্তে প্রতিরোধের প্রয়োজন ; কেবল আদালত থেকে নয়, নাগরিক, সুশীল সমাজ এবং সংসদ থেকেও। আমাদের অবশ্যই এই নীতি পুনরুদ্ধার করতে হবে যে ভোটাধিকার জনগণের, কাগজপত্রের নয়। রাস্তা, সমাজ এবং সুপ্রিম কোর্টকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে হবে যে মা ভারত তার সব সন্তানদের এবং তিনি তাদের সুরক্ষা চাওয়ার সময় ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বৈষম্য করেন না।

ইতিহাসবিদ ওর্নিট শানি তাঁর বই How India Became Democratic-এ আমাদের মনে করিয়ে দেন, সর্বজনীন ভোটাধিকার কোনো প্রশাসনিক দুর্ঘটনা ছিল না, এ ছিল এক পরিকল্পিত উল্লম্ফন। আমলা এবং নাগরিকরা একসঙ্গে একটা ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে গণতান্ত্রিক মানসিকতায় রূপান্তরিত করেছিল। সেই অর্জনকে সতর্কতার নামে নষ্ট করা যায় না।

ইসিআই-এর মনে রাখা উচিত যে নির্বাচন প্রবেশিকা পরীক্ষা নয়। এটা একটা অংশগ্রহণের কাজ। এবং একটা গণতন্ত্রে, আপনাকে প্রমাণ করতে হবে না যে আপনি এই দেশের লোক। আপনি ভোট দেন তার কারণই হল আপনি একজন নাগরিক। এবং আপনি একজন নাগরিক কারণ সংবিধান তা বলে, আপনার জন্ম সনদ খুঁজে পাওয়ার জন্য নয়।

ভোট কেবল একটা নথি নয়। এ একটা ঘোষণা যে, আমরা সকলেই সমান। একজন মানুষের একটা ভোট এবং একটা ভোটের দাম হলো ঠিক এক । এমনকি আমার ১৪০ কোটি ভোটের মধ্যে একটা ভোট থাকলেও, সেটা প্রজাতন্ত্রে একটা সমান অংশ, যেখানে আমি এবং প্রতিটি ভারতীয় সমান অংশগ্রহণকারী। সেই মালিকানা এবং অংশগ্রহণের অধিকারই এখন ঝুঁকিতে রয়েছে।

লেখক সুপ্রীম কোর্ট- এর বিশিষ্ট আইনজীবী।

অনুবাদ সিদ্ধার্থ বসু (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রের সৌজন্যে)।

বরাক উপত্যকার নাগরিক সমাজের আবেদন
ভাষা ও জাতিসত্তার উপর আক্রমণ মানব না

সুধী বরাকবাসী,

আমাদের জাতীয় আদিপাপ হিসেবে গণ্য দেশভাগের ফলে বহু উপভাষা ও বিভাষার সমৃদ্ধি সম্পন্ন বাংলা ভাষা এবং খণ্ডিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থানকারী বাংলাভাষী বাঙালি অভূতপূর্ব বিপন্নতার মুখোমুখি। গত কিছুদিনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, দেশভাগের মতো মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির ৭৮ বছর পরেও রাষ্ট্রশক্তি বাঙালি-বিদ্বেষকে অঙ্গারের মতো জ্বালিয়ে রেখেছে। বিশেষভাবে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি রাষ্ট্রতন্ত্র ভাষিক আধিপত্যবাদকে নিজেদের প্রধান নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে সংবিধান অবমাননা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুভাষিক এই দেশে কোনো একটি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে নির্দিষ্ট না হলেও বছরের পর বছর ধরে অপপ্রচার করে মিথ্যাকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সহ অসমিয়া-মণিপুরি-তামিল-তেলেগু-মারাঠি-মালয়ালম প্রতিটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষা। এদের সঙ্গে গুজরাটি বা হিন্দি সহ সমস্ত ভাষাই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাওয়া উচিত। কিন্তু তার বদলে সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে পদদলিত করে রাষ্ট্রশক্তি বাঙালি-বিদ্বেষকে হিংস্র ঘৃণা ও আক্রোশের গিলোটিনে পরিণত করতে চেয়েছে। তাই ভারতীয় ভাষার বিজ্ঞান-সম্মত ধারণাকে জলাঞ্জলি দিয়ে শাসকদলের ঢোল-বাদক এক ব্যক্তি বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করেছে। বাংলাভাষী বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও ভাষা-গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অবাঙালি সচেতন জনেরাও চরম ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর বরাক উপত্যকার সমস্ত সচেতন বাংলাভাষীও সঙ্গত কারণেই তীব্র অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশকে প্রত্যাখ্যান করছেন।

বস্তুত কয়েক প্রজন্ম ধরে আমরা যে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত ধ্যানের ভারত গড়ে তুলেছি, তাকেই ধ্বংস করার চক্রান্ত এখন রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রত্যক্ষ মদতে সাধারণ ভাবে ভাষা গণতন্ত্র এবং বিশেষভাবে বাংলাভাষী জনগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে আমরা একচক্ষু হরিণের ভূমিকা নিতে পারি না। মহাবিনাশের সার্বিক আয়োজন যখন চরম দুঃসময়ের বার্তা নিয়ে এসেছে, আমাদের ধ্রুবপদ হোক বাঙালি জাতির একমাত্র গোত্রলক্ষণ তার অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি। শ্রীহট্টীয় সহ বিভিন্ন উপভাষা আমাদের সমৃদ্ধির প্রমাণ। চক্রান্তকারীদের উদ্দেশে স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি ভাষাবিজ্ঞানের বিধি অর্থাৎ উচ্চারণতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যগঠনতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ না জেনে যারা আমাদের উপভাষা এবং সমৃদ্ধ ভাষিক পরিচয়কে অপমান করতে চায়, তারা প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংহতির মূলেই কুঠারাঘাত করে। কিন্তু অসূয়াপ্রবণ জাতি-বিদ্বেষীদের হিংস্র আক্রমণ আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তাই বিকার ও বিদূষণ-সর্বস্ব অপশক্তিকে যেকোনো মূল্যে আমরা প্রতিহত করবই।

এই মুহূর্তে নানা কারণে দেশ যখন বহুমুখী সংকটের মোকাবিলা করছে, সে সময় বাংলা সহ সমস্ত রাজ্যভাষার মর্যাদা রক্ষা করাই আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামূহিক দায়িত্ব। অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের দীর্ঘমেয়াদি চক্রান্তের কাছে কোনো গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ আত্মসমর্পণ করতে পারেন না। জাতিসত্তাকে প্রত্যক্ষ সত্যের মতো অনুভব করার সামর্থই আমাদের মুক্তি দিতে পারে। সেইজন্যে বাংলাসহ সমস্ত ভারতীয় ভাষার সমমর্যাদার ভিত্তিতে নতুন দেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করছি। মনে রাখছি, বিবিধ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ শ্রীহট্টীয় ও অন্যান্য উপভাষা কোনো কুচক্রীর উদ্ধত অপপ্রচারে যেমন মিথ্যা হয়ে যায় না; তার চেয়ে অনেক বড় সত্য হল বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, অবনীন্দ্রনাথ, শহীদুল্লাহ, নীহাররঞ্জন রায়-এর বাংলা ভাষা অভিন্ন জাতিসত্তার অভিব্যক্তিতে দেদীপ্যমান ছিল, আছে এবং থাকবে। এই ভাষাকে যারা আক্রমণ করে, তারা নিজেরাই চূর্ণ হয়ে যাবে। বাংলাদেশে এবং ভারতের নানা প্রান্তে যারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, অজস্র স্থানিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, তাঁরা প্রত্যেকেই বাঙালি। 'বাংলাদেশি' ভাষা বলে কিছু কোথাও নেই। অজ্ঞতার সঙ্গে যখন দুরভিসন্ধি যুক্ত হয়,তখন পাগলের প্রলাপ তৈরি হয়।

কিন্তু সেইজন্যে একে লঘুভাবে দেখলে ভয়ানক ভুল হবে।

তাই আসুন, আমরা এই সংকটের প্রহরে নতুনভাবে বাঙালি জাতির হওয়া এবং হয়ে ওঠার ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে নিই। আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে রাখার সোনার কাঠি জোগান দিক দৃঢ় ঐক্যের বোধ। একে অন্যকে আহ্বান জানাই, 'আসুন মায়া ছড়াই'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণীই হোক এ সময়ের সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার 'বাঙালি বাংলায় জন্মেছে বলেই সে বাঙালি তা নয়। বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার তৈরি হয়েছে বলেই সে বাঙালি'। (সাহিত্যের পথে রবীন্দ্ররচনাবলী , চতুর্দশ খণ্ড , পৃ ৩৭৭) এবং 'আমরা একই জাতি সুখে-দুঃখে আমাদের এক দশা এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।' (আত্মশক্তি ও সমূহ রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড পৃঃ ৮১৩)

আসুন, জাতিসত্তাকে চিরজাগ্রত রেখে আমরা নতুন করে যৌথ জীবনকে স্বপ্ন করে তুলি, স্বপ্নের মধ্যে বাঁচি। এমন বাঙালি খাঁটি বাঙালি হয়েই সংকটগ্রস্ত ভারতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরি। বাঙালি-বিদ্বেষী কুচক্রীরা আমাদের যে-পরীক্ষার মুখোমুখি করেছে, বরাক উপত্যকার সংগ্রামী মানুষরা ভাষা-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিক।

আসুন সমস্বরে বলি 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর...'

বিনীত

ড. তপোধীর ভট্টাচার্য ,অধ্যাপক দিলীপ কুমার দে

তৈমুর রাজা চৌধুরী, মিথিলেশ ভট্টাচার্য

ড. দেবাশিস ভট্টাচার্য , নির্মল কুমার দাস, সঞ্জীব দেবলস্কর

মন্দিরা নন্দী, নীতিশ ভট্টাচার্য , শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

গৌতম প্রসাদ দত্ত , পরিতোষ চন্দ্র দত্ত, ড. স্বপন পাল ,

দিলীপকান্তি লস্কর, ড. সুশান্ত কর , মশহুরুল বারী

সুব্রত কুমার পাল (আইনজীবী), শিখা ভট্টাচার্য ,সুকল্পা দত্ত,

আতিকুর বারি চৌধুরী (আইনজীবী)জ্যোতিরিন্দ্র দে,

খলিল আহমেদ মজুমদার ,রত্নদীপ দেব , জয়শ্রী ভূষণ

এবং আরো অনেক।

মেয়েদের দুয়ারে সরকার

অশোক সরকার

কয়েক বছর ধরে দেখছি সরকারের বিশেষ নজর পড়েছে মেয়েদের উপর। মমতা বলছেন তিনি দিয়েছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর কন্যাশ্রী, মোদী বলছেন তিনি দিয়েছেন উজ্জ্বলা গ্যাস, লাখপতি দিদি। কেউ বলছেন সরকার নারী পুরুষের মধ্যে সাম্য আনার চেষ্টা করছে, কেউ বলছেন মেয়েদের আলাদা ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করতে চাইছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল। আসলে কি হচ্ছে?

আসলে কি হচ্ছে দেখতে গেলে তথ্য লাগে। মেয়েদের জন্য আলাদা করে কি করা হচ্ছে বুঝতে হলে দেখতে হবে জেন্ডার বাজেট। এই কাহিনীর শুরু ২০০৫-২০০৬ সালে। কেন্দ্রীয় সরকার ও তার পরে ক্রমশ রাজ্য সরকারও জেন্ডার বাজেট পেশ করতে শুরু করে, যাতে বোঝা যায় মেয়েদের জন্য সরকারের কি পরিকল্পনা আছে। জেন্ডার বাজেট দু ভাবে তথ্যটি পেশ করে, (১) সেই সব কর্মসূচী যা ১০০ ভাগ মেয়েদের জন্য, আর (২) সেই সব কর্মসূচী যা আংশিকভাবে মেয়েদের জন্য। এই দুটি হিসেব যোগ দিয়ে বলা হয় জেন্ডার বাজেট। যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা শুধু মেয়েরাই পায়, তাই তা প্রথম অংশে পড়ে, আর ১০০ দিনের কাজে মেয়ে পুরুষ সবাই কাজ পায় তাই তা দ্বিতীয় অংশে পড়ে।

কিন্তু প্রথম অংশের সব কর্মসূচী তো এক রকম নয়। এক ধরণের কর্মসূচী আছে যা সরাসরি মেয়েদের ব্যাঙ্কের খাতায় ব্যক্তিগত টাকা পৌঁছে দেয়। যেমন বিধবা পেনশন, বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। আরেক ধরণের কর্মসূচী আছে যার টাকা মেয়েদের নামে দেওয়া হয়, কিন্তু উপকার পায় পরিবারের অনেকে। যেমন আবাস যোজনা, জাতীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশন। অন্য এক ধরণের কর্মসূচী আছে যা এক অর্থে মহিলা কেন্দ্রিক, কিন্তু টাকা মেয়েরা পান না, তবে সুফল মেয়েরাই পেয়ে থাকেন, যেমন স্কুলে মেয়েদের জন্য টয়লেট।

আসুন দেখি এই তিন খাঁচায় কেন্দ্রীয় সরকারের জেন্ডার বাজেটের প্রথম অংশের বড় খরচাগুলিকে বন্দি করলে ছবিটা কেমন দাঁড়ায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৪-২৫ সালের জেন্ডার বাজেটে ১০০ ভাগ মহিলা কেন্দ্রিক খরচার বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	
যে টাকা সরাসরি মেয়েরা পান	
বিধবা পেনশন	২০২৬
যে টাকা মেয়েদের নামে দেওয়া হয়, কিন্তু সুফল মেয়ে পুরুষ সবাই পান	
নামো ড্রোন দিদি (স্বনির্ভর দলকে চাষের কাজের জন্য ড্রোন বিতরণ)	৫০০
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহরে)	২৬১৭০
এল পি জি কনেকশন	৯০৯৪
প্রধান্মন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামে)	৫৪৫০০
জাতীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশন	১৫০৪৭

যে টাকা মেয়েরা পান না, কিন্তু প্রকল্পের সুফল মূলত মেয়েরা পেয়ে থাকেন	
পোষণ ২.০	৪৫০
সম্বল যোজনা	৬২৯
সামর্থ্য যোজনা	২৩৬৬

প্রথম অংশের মোট ১১২,৩৯৪ কোটি টাকার মধ্যে এই কটি খরচার বরাদ্দই হল ১১০৭৮২ কোটি, অর্থাৎ ৯৯। বাকি আরও ২০-২১টা আইটেম যোগ দিলে হবে ২০০০ কোটি টাকার কম। গত বছর এই প্রথম অংশে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৩,০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রায় ২৯,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ বেড়েছে, যার মধ্যে শুধু আবাস যোজনাতেই বেড়েছে ২৬,০০০ কোটি টাকা। বিধবা পেনশনে বরাদ্দ গত তিন বছর ধরে একই আছে। আর গ্যাস কনেকশনে বরাদ্দ বেড়েছে ৫০০ কোটি।

এর মধ্যে সম্বল ও সামর্থ্য প্রকল্প দুটি গুরুত্বপূর্ণ। সম্বল আসলে চারটি প্রকল্পের সংযুক্ত নাম , ওয়ান স্টপ সেন্টার, মহিলা হেল্প লাইন, বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও, আর নারী আদালত। এর প্রত্যেকটি কোন না কোন ভাবে মেয়েদের নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সারা দেশের জন্য বরাদ্দ মাত্র ৪৫০ কোটি। সামর্থ্য প্রকল্প মেয়েদের অর্থনৈতিক সশক্তিকরণের জন্য চলতে থাকা চারটি প্রকল্পের সংযুক্ত নাম , ক্রেশ, স্বাধারগৃহ, মাতৃবন্দনা যোজনা, ও মহিলা কর্মীদের জন্য হস্টেল। এতে সারা দেশের জন্য বরাদ্দ মাত্র ২৩৬৬ কোটি। অর্থাৎ এই প্রকল্পগুলি মহিলাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সরকারের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দ্বিতীয় অংশের কাহিনীটা যথেষ্টই ঘোলাটে। কারণ এই অংশে যে সব প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, দাবী করা হয়, তার ৩০ থেকে ৯৯ ভাগ মহিলাদের জন্য। এর মধ্যে ১০০ দিনের কাজে কতজন মহিলা মজুরি পান তার তথ্য জনসমক্ষে আছে, এবং তা ৫০ ভাগের বেশি। কিন্তু আদিবাসীদের জন্য যে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় আছে, তাতে কতজন মেয়ে রয়েছে, বা বৃদ্ধ পেনশনও যে কতজন মহিলা পাচ্ছেন তা জনসমক্ষে নেই। আই আই টি বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে অর্থ সাহায্য যাচ্ছে তাতে কত ভাগ মেয়েরা উপকৃত হচ্ছেন তাও জানার উপায় নেই। দ্বিতীয় অংশে ১০০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দের যে সব প্রকল্প আছে তা হলো-

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৪-২৫ সালের জেন্ডার বাজেটে ৩০-৯৯ % ভাগ মহিলা কেন্দ্রিক খরচার বরাদ্দ	
প্রকল্প	(কোটি টাকায়)
বৃদ্ধ বয়সের পেনশন	৬৬৪৫
প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা	১৪৪৭
১০০ দিনের কাজ	২৮৮৮৮
সমগ্র শিক্ষা অভিযান	১১২৫০
অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র	১৫৯০০
একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়	১৯১৯
তপশীলি জাতি ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপ	১৯০৪
কুসুম প্রকল্প	১৯৯৬
রুফ টপ সোলার	৪৫৫৫
জল জীবন মিশন	৩৪১৬২
স্বছ ভারত মিশন (গ্রামে)	২৫৭৯
প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা	৩৬০০
স্বাস্থ্য পরিকাঠামো চালু রাখা	৬৬৬৪
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সশক্তিকরণ	১৫৪৫৬

উপরের প্রকল্পগুলি দেখলে এটাই পরিষ্কার হয় যে ৩০-৯৯ এর ভিত্তিটা একটা আনুমানিক ভিত্তি। এবং এই তথ্য থেকে দুটি সোজা প্রশ্ন তোলা যায়। প্রথমত এর মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্পে কত মেয়ে উপকৃত হচ্ছে তার সুস্পষ্ট হিসাব নেওয়া সহজেই সম্ভব, তবু তা জনসমক্ষে নেই কেন? আর দুই, কিছু প্রকল্পে যেমন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো চালু রাখা প্রকল্পে সত্যিই কে উপকৃত হচ্ছে তা স্পষ্ট নয়, এবং সেগুলির এখানে স্থান হওয়া উচিত নয়।

তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেন্ডার বাজেটের চিত্রটা বেশ অন্য রকম। মেয়েদের দুয়ারে সরাসরি টাকা পৌঁছে দেবার ব্যাপারে রাজ্য সরকার অনেকটাই এগিয়ে। রাজ্যের নিজস্ব বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে অনেক বেশি। জেন্ডার বাজেটের প্রথম অংশের মোট বরাদ্দ ২১৩৮০ কোটি টাকার মধ্যে ১৯৭৬৮ কোটি টাকাই (৯২) সরাসরি মেয়েদের দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছেন মমতা। এমনকি দেশের মধ্যেও এ ব্যাপারে তিনি অগ্রগণ্য বললে ভুল হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০২৪-২৫ সালের জেন্ডার বাজেটে ১০০ ভাগ মহিলা কেন্দ্রিক খরচার বরাদ্দ (কোটি টাকায়) যে টাকা সরাসরি মেয়েরা পান	
বিধবা পেনশন- জয় বাংলা প্রকল্প	২৬৭৩
জাতীয় বিধবা পেনশন প্রকল্প	৩৪৩
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার	১৪৪০০
কন্যাশ্রী	১৩৮৪
রুপশ্রী	৭০৪
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অতিরিক্ত ভাতা	২৬৭

যে টাকার মেয়েদের নামে দেওয়া হয়, কিন্তু সুফল মেয়ে পুরুষ সবাই পান	
জাতীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশন- আনন্দধারা	৭৬৬
যে টাকা মেয়েরা পান না, কিন্তু তার সুফল মূলত মেয়েরা পেয়ে থাকেন	
নিঃস্ব সংখ্যালঘু মেয়েদের পুনর্বাসন	৩২০

এর মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে গত বছরের তুলনায় ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বেড়েছে, আর কন্যাশ্রীতে ১৫০ কোটি, আর বিধবা পেনশনে ৩৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ কমেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অস্পষ্টতা থেকেই যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতই রাজ্য সরকারও এমন সব প্রকল্প এই খাতে দেখাচ্ছে, যার মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্পে সত্যিই কত মেয়ে উপকার পেল তা গণনা করা সম্ভব কিন্তু তা জনসমক্ষে নেই, আর কিছু প্রকল্প কত জন মেয়ে উপকৃত হচ্ছেন তা গণনা করা প্রায় অসম্ভব। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০২৪-২৫ সালের জেন্ডার বাজেটে ৩০-৯৯% ভাগ মহিলা কেন্দ্রিক খরচার বরাদ্দ	
প্রকল্প	(কোটি টাকায়)
যে সব প্রকল্পে উপকৃত মেয়েদের সংখ্যা নির্ধারণ সম্ভব কিন্তু তা জনসমক্ষে নেই	
কৃষকবন্ধু প্রকল্প	২৫৯২
মৃত কৃষকের পরিবারকে এককালীন সহায়তা	৪৫৫
বাংলা শস্য বীমা যোজনা	৩৬০
সমগ্র শিক্ষা অভিযান	১৪৬১
স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প	১৪০২
১০০ দিনের কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প	১৪২৩
গ্রামীণ আবাস যোজনা	৩২২৪
যে সব প্রকল্পে উপকৃত মেয়েদের সংখ্যা নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব	
প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলে প্রশাসনিক খরচা	১৪১৩২
অ-সরকারি কলেজে সহায়তা	১২৯৫
ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতগুলিকে সহায়তা	১৭৮৬

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। তবে এই কয়েকটা উদাহরণ দেখলেই বোঝা যাবে, কোন প্রকল্পে কতজন মেয়ে উপকৃত হচ্ছেন তা বলা যায়, আর কোন প্রকল্পে তা বলা কঠিন বা প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু মূল কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। এক) প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি বাজেটের মাত্র ৫ ভাগ জেন্ডার বাজেটের অংশ, কত ১৫ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে তা আড়াই থেকে ৫ ভাগ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষেত্রে তা রাজ্য বাজেটের প্রায় তিনভাগের এক ভাগ। একটি হিসেবে দেখছি অনেকগুলি রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রেই জেন্ডার বাজেট, রাজ্যের বাজেটের হয় চার ভাগের এক ভাগ নয়ত তিনভাগের এক ভাগ। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় অংশের বরাদ্দ প্রথম অংশের প্রায় আড়াইগুণ। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকার মেয়েদের দিচ্ছে অনেক কম, বলছে বেশি। দুই) জেন্ডার বাজেটের দ্বিতীয় অংশটি কেন ৩০ থেকে ৯৯ ভাগ মহিলাদের জন্য দেখানো হবে? কেন মহিলা ও পুরুষের তথ্য আলাদা করে সংগ্রহ করে সুস্পষ্ট করে বলা যাবে না যে কোন প্রকল্পে সত্যিই কত মহিলা উপকৃত হচ্ছেন। আর যে সব প্রকল্পে তা করা কঠিন সেখানে কেন তা স্বীকার করা হবে না? তিন) প্রথম অংশের মোট বরাদ্দ, বিশেষত যেখানে টাকা সরাসরি মেয়েরা না পেলেও সুফল মূলত তাঁরাই পেয়ে থাকেন, তার বরাদ্দ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে বাড়বে না? নারী আদালত, হেল্প লাইন, কর্মরত মেয়েদের হস্টেল ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা দুইই বাড়ায়, কেন সেই ধরণের প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ অতি নগণ্য হয়ে থাকবে?

মূল প্রশ্নটা থেকেই যায়। জেন্ডার বাজেট সরকারি খরচার কোনটা কতটা মেয়েদের জন্য তা দেখায়, কিন্তু সরকারি খরচার দিশা নির্দেশটা কি? নারী পুরুষের সাম্য আমদের সংবিধানের একটা প্রতিশ্রুতি। তাহলে কোন কোন পথে তার দিকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায়ে এগোনো সম্ভব, এবং বাজেটে তার প্রতিফলন কি? এর উত্তরে নানা মুনির নানা মত হবে। কেউ বলবেন মেয়েদের হাতে আরও টাকা পৌঁছে দাও তাহলে তাদের সামাজিক ক্ষমতা ও কণ্ঠস্বর বাড়বে, কেউ বলবেন আরও বেশি মেয়েদের রোজগার দাও, তাহলে মেয়েরা স্বাধীন হবে। কেউ বলবেন ভারতের মাটিতে নারী পুরুষ সাম্যের লড়াইটা মূলত সমাজ-মানসিক, তাই এমন প্রকল্প নিতে হবে যাতে সমাজ-মানসিকতা পালটায়। কেন্দ্রীয় সরকারের জেন্ডার বাজেট থেকে নারী পুরুষ সাম্যের পথে বাজেটের দিশা নির্দেশটা কি তা স্পষ্ট হয় না। বরং রাজ্যের বাজেট থেকে মনে হয়, মেয়েদের দুয়ারে টাকা পৌঁছে দেওয়াটাই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি মমতার টাকা আর মোদীর টাকা বলে কিছু থাকত তা হলে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা অন্তত বলতেন যে 'আমার দিদির টাকাই বেশি পেয়েছি, মোদীর টাকা যৎসামান্য।'

(লেখক আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫- অযৌক্তিক ও অন্যায্য

মজিবুর রহমান

পার্লামেন্ট বা সংসদ হল সর্বোচ্চ আইনসভা। যেকোনো বিষয়ে আইন রচনা করা সংসদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।সংসদে দেশের সংবিধান সংশোধন, বিভিন্ন বিষয়ে পুরনো আইন বাতিল বা সংশোধন করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী বিল হিসেবে বিষয়টি সংসদ কক্ষে উত্থাপন করেন। সাংসদরা আলোচনা ও ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেন। সংসদে পাস হওয়া বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে আইনে পরিণত হয় এবং তার প্রয়োগ হতে শুরু করে। কিছু কিছু বিল বা আইন নিয়ে সংসদ ভবন এবং রাষ্ট্রপতি ভবনের চৌহদ্দির বাইরে বৃহত্তর জনপরিসরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ তথা ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ তেমনই একটি বিষয়।

২০২৪ সালের ৮ই আগস্ট কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু লোকসভায় ওয়াকফ সম্পর্কিত একটি বিল উত্থাপন করেন। বিরোধী দলের সাংসদরা বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এটি পর্যালোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি জানান। পরের দিনই লোকসভার ২১ ও রাজ্যসভার ১০ মোট ৩১ জন সাংসদকে নিয়ে একটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি (জেপিসি) গঠন করা হয়। চেয়ারম্যান হন উত্তর প্রদেশের বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল। কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ২২শে আগস্ট। জনগণকে বিলটির ব্যাপারে ২৯শে আগস্ট থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মতামত নথিভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়। জেপিসি'র সদস্যরা দেশের বিভিন্ন শহরে যান এবং ওয়াকফের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আলোচনা করেন। জেপিসি'র একটি বৈঠকে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সময় কাঁচের গ্লাস ভেঙে পশ্চিমবঙ্গের একজন সাংসদের হাত কেটে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। যাইহোক, জেপিসি ২৫টি সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট জমা দেয়। ২০২৫ সালের ৩রা এপ্রিল লোকসভায় ওয়াকফ বিল নিয়ে ভোটাভুটি হয়। বিলটির পক্ষে ২৮৮টি আর বিপক্ষে ২৩২টি ভোট পড়ে। ৪ঠা এপ্রিল রাজ্যসভায় ১২৮-৯৫ ভোটে বিলটি পাস হয়। ৫ই এপ্রিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়। আইনটির পোশাকি নাম 'একীভূত ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতায়ন, দক্ষতা ও উন্নয়ন আইন, ১৯৯৫'। ইংরেজিতে 'ইউনিফাইড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এম্পাওয়ারমেন্ট, এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৯৫'।

নতুন ওয়াকফ আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজনীতিবিদ, নাগরিক সংগঠন এবং আইনজীবীদের পক্ষ থেকে অন্তত ৬৫টি আবেদন জমা পড়ে।বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন অল ইন্ডিয়া মজলিস ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন-এর সাংসদ ব্যারিস্টার আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি, জমিয়াত উলামা ই হিন্দ-এর শীর্ষ নেতা আরশাদ মাদানি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাংসদ ইমরান মাসুদ ও রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সাংসদ মনোজ কুমার ঝা। আইনটির বিরুদ্ধে আদালতের বাইরে রাজপথেও আন্দোলন হয়। কোথাও কোথাও আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠে এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এরূপ একটি এলাকা হল মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ। অন্যদিকে, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও আসাম প্রভৃতি কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্য আইনটির প্রতি তাদের সমর্থনের কথা আদালতকে জানায়। এপ্রিল-মে মাসে একাধিকবার শুনানি হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে আইনটির বাস্তবায়ন বন্ধ রয়েছে।

ইসলাম ধর্মে ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সম্প্রদান করাকে ওয়াকফ বলা হয়। এই অনুদানকে মুশরুত উল খিদমত এবং যিনি এই দান করেন তাঁকে ওয়াকিফ বলা হয়। ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে বলা হয় মুতাওয়াল্লি। ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তর অথবা বিক্রি করা যায় না। জমি জায়গা, ঘরবাড়ি, টাকা পয়সা প্রভৃতি যেকোনো জিনিসই ওয়াকফ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ওয়াকফ সম্পত্তিতে নির্মিত ও পরিচালিত হয় মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা, মাজার, স্কুল, ঈদগাহ, দরগাহ, খানকাহ, ইয়াতিমখানা, মুসাফিরখানা, ইমামবাড়া, দালানকোঠা, কবরস্থান, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার, দোকান, কৃষিজমি, পুকুর প্রভৃতি। ওয়াকফ তহবিল থেকে প্রদান করা হয় ইমাম, মোয়াজ্জিনদের ভাতা। দুস্থ, মেধাবী পড়ুয়া এবং পীড়িত, প্রতিবন্ধী মুসলিমদের আর্থিক সহায়তা করার সংস্থানও রয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম পালন ও প্রচার এবং মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে বেশকিছু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওয়াকফ ব্যবস্থা সংযুক্ত। ওয়াকফের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন সময়ে ভারতের মুসলিম সম্রাট, সুলতান, নবাব, জমিদাররা তাঁদের প্রভূত সম্পত্তি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে দান করে গেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে। মুহাম্মদ ঘুরি (১১৪৪-১২০৬) ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠার পর দুটি গ্রাম ওয়াকফ হিসেবে দান করেন। শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১১৮০-১২৩৬), আলাউদ্দিন খিলজি (১২৬৬-১৩১৬) ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১২৯০-১৩৫১) প্রমুখ মুসলিম শাসকরা ওয়াকফ সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের (১৫২৬-১৮৫৭) সময় ওয়াকফ ব্যবস্থার আরও প্রসার ঘটে। বিশ্ববিখ্যাত সৌধ তাজমহল একটি ওয়াকফ সম্পত্তি। বাংলার প্রখ্যাত দানবীর অকৃতদার হাজী মুহাম্মদ মহসিন (১৭৩০-১৮১২) তাঁর বিপুল সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। এখনও বিত্তশালী মুসলমানরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে দান করে চলেছেন। এর ফলে, ভারতে বিশাল পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তি গড়ে উঠেছে। মার্চ, ২০২৫-এর একটি হিসাব অনুযায়ী, এখন ৩৮ লক্ষ একরের বেশি এলাকা জুড়ে ৮ লক্ষ

৭২ হাজারের বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি ছড়িয়ে রয়েছে। ২০০৬ সালে সাচার কমিটি ওয়াকফ সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণ করে ১.২ লক্ষ কোটি টাকা। ওয়াকফ সম্পত্তিগুলির মধ্যে বেশি পরিমাণে রয়েছে কবরস্থান (১৭), কৃষিজমি (১৬), মসজিদ (১৪) এবং দোকান (১৩)। ওয়াকফ সম্পত্তি বিদ্যমানতার নিরিখে ভারতের প্রথম তিনটি রাজ্য হল উত্তর প্রদেশ (২৭), পশ্চিমবঙ্গ (১০) ও পাঞ্জাব (৯)। পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তির সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৮০ হাজার এবং এলাকার পরিমাণ ৮২ হাজার একর। এরাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর রয়েছে ১৫৮টি স্কুল, ৪টি মডেল ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা, ১৯টি মুসলিম হোস্টেল, ৯টি হাসপাতাল এবং ১টি শপিং কমপ্লেক্স। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, রেল ও প্রতিরক্ষা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য যেকোনো দপ্তরের ভূসম্পত্তির থেকে ওয়াকফ ল্যান্ডের পরিমাণ বেশি। শুধু তাই নয়, ভারতে যত ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে বিশ্বের কোনো মুসলিম দেশেও তত ওয়াকফ সম্পত্তি নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুসলিম সমাজের ওয়াকফ সম্পত্তির মতোই হিন্দু সমাজে রয়েছে 'দেবোত্তর সম্পত্তি'। মঠ, মন্দির, টোল, শ্মশান এবং নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনায় দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এসব রয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতে কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার ভার সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গঠিত ট্রাস্টের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলে রচিত ধর্মীয় সম্পত্তি আইন আজও প্রায় একই রয়ে গেছে। মুসলিম ওয়াকফ ব্যবস্থাকে সংগঠিত ও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯১৩, ১৯২৩ এবং ১৯৩১ সালে ওয়াকফ আইন তৈরি করা হয়। স্বাধীন ভারতে ওয়াকফ আইন রচিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই আইন অনুসারে, রাজ্য পর্যায়ে ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয়। এখন দেশে মোট ৩২টি ওয়াকফ বোর্ড রয়েছে। বিহার ও উত্তর প্রদেশে শিয়া ও সুন্নিদের পৃথক ওয়াকফ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইনের সামান্য সংশোধন করা হয়। ওয়াকফ বোর্ডগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্য ১৯৬৪ সালে জাতীয় স্তরে ওয়াকফ কাউন্সিল গঠন করা হয়। ১৯৬৯ ও ১৯৮৪ সালেও ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইনের অল্পবিস্তর সংশোধন করা হয়। ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইন ও তার সমস্ত সংশোধনীগুলো বাতিল করে ১৯৯৫ সালে নতুন ওয়াকফ আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী ওয়াকফ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ২০১৩ সালে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের সামান্য সংশোধন করা হয়। ২০২৪ সালের উত্থাপিত বিল তথা ২০২৫ সালের আইনে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের খোলনলচে বদলে ফেলা হয়েছে। ১৯৫৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ওয়াকফ আইন বা তার সংশোধনী নিয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দেয়নি কারণ সেগুলোর উদ্দেশ্য ভালো ছিল। কিন্তু ২০২৪-২৫ সালের ওয়াকফ সংশোধনী নিয়ে আপত্তি করার অনেক কারণ রয়েছে। নতুন ওয়াকফ আইন কয়েক শতাধী ধরে মুসলিম সমাজের দ্বারা গঠিত সম্পত্তি, মুসলিম সমাজের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তি এবং মুসলিম সমাজের দ্বারা পরিচালিত সম্পত্তি থেকে মুসলিম সমাজের অধিকার খর্ব করবে। এই আইনের কারণে ভারতের মুসলিম সমাজ ধর্ম পালন ও নানাবিধ ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং তারা আর্থিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

এতদিন ওয়াকফ করা যেত (ক) মৌখিক অথবা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে ঘোষণার দ্বারা, (খ) ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ব্যবহারের দ্বারা, (গ) উত্তরাধিকার রেখা শেষ হলে (ওয়াকফ আলাল আওলাদ)। নতুন আইন অনুযায়ী, (ক) অন্তত পাঁচ বছর ধরে ইসলাম ধর্ম অনুশীলন না করলে কেউ ওয়াকফ করতে পারবে না। (২) ওয়াকিফকে ঘোষিত সম্পত্তির মালিক হতে হবে। ব্যবহারকারী দ্বারা ওয়াকফের অধিকার থাকবে না। (৩) উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করে ওয়াকফ করা যাবে না। নতুন আইনে ওয়াকফ বাই ইউজার রদ হওয়ার ফলে প্রচুর ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলিম সমাজের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখ্য, ৮.৭২ লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে ব্যবহারকারী দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ ৪.০২ লক্ষ।

এতদিন একজন কমিশনার ওয়াকফ সম্পত্তির জরিপ পরিচালনা করতেন। এখন তা করবেন জেলা কালেক্টর। ওয়াকফ হিসেবে চিহ্নিত সরকারি সম্পত্তি আর ওয়াকফ থাকবে না। কালেক্টর এই সব সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণ করবেন এবং রাজ্য সরকারকে প্রতিবেদন জমা দেবেন। সরকারি সম্পত্তি হলে রাজস্ব রেকর্ড হালনাগাদ করা হবে। এর ফলে, অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।

ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের সভাপতি হন ওয়াকফের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সভাপতি ব্যতীত কাউন্সিলের সকল সদস্যকে মুসলমান হতে হয়। কিন্তু ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ অনুযায়ী কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অমুসলিম হওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। পুরনো আইন অনুযায়ী রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের সভাপতি সহ সকল সদস্য মুসলমান হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু নতুন আইনে দু'জন মহিলা সদস্যের মুসলিম হওয়ার শর্ত ছাড়া সভাপতি সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা সকলেই অমুসলিম হতে পারেন। ওয়াকফ বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) মুসলিম হওয়ার বাধ্যবাধকতা দূর করা হয়েছে। ওয়াকফ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনালে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞের অন্তর্ভুক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে। এতদিন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হত। এখন ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করা যাবে। পুরনো আইন অনুযায়ী কাউন্সিল ও বোর্ডের সদস্যরা কিছু নির্বাচিত ও কিছু মনোনীত হতেন। কিন্তু নতুন আইনে সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। মুসলিম সমাজের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের

প্রশাসনে মুসলিমদেরই প্রতিনিধিত্ব প্রায় শূন্য হয়ে যাওয়া অথবা ভীষণ ভাবে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার আইন পুরোপুরি প্রথাবিরোধী। যেকোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক রীতি। যেমন, শিখ গুরুদ্বার আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী বোর্ড ও কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে শিখ হতে হয়। দেবোত্তর সম্পত্তি দেখভাল করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাস্টে সাধারণভাবে কোনো অহিন্দুকে রাখা হয় না। তাহলে মুসলিমদের ওয়াকফ প্রশাসনে অমুসলিম সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করার ভাবনা আসছে কেন? বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিমদের ওয়াকফের বিষয়ে একটা চরম অন্যায্য ও অযৌক্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইছে।

সাংবিধানিকভাবে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধানে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল ধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখা তথা কোনো ধর্মের বিরোধিতা না করার কথা বলা হয়েছে। ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ধর্মাচরণের সময় রাষ্ট্রের বিরোধিতা, সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন বা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টের কোনো ঘটনা না ঘটলে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার নাক গলাবে না। ওয়াকফ মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত আইনের আওতায় পড়ে। সুতরাং ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যাপারে সঙ্গত কারণ ছাড়া সরকারের হস্তক্ষেপ প্রত্যাশিত নয়। সংবিধানের ২৬ নাম্বার অনুচ্ছেদে ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ও পরিচালনার অধিকার সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৭ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় অর্থকে করমুক্ত করেছে। অনুচ্ছেদ ২৯ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনুচ্ছেদ ৩০ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দিয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩০০(ক) কাউকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না করার কথা বলেছে। কাজেই বলা যায়, সংবিধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমদের যে মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে নতুন ওয়াকফ আইনে তা হরণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের জন্মলগ্ন থেকেই চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের বিপদে বা বিড়ম্বনায় ফেলার চেষ্টা করে। আর এস এস-বিজেপির এই অবস্থানের কথা কারোর অজানা নয়। সম্প্রতি সেটাই আরও বাড়তে দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বর্তমানে বিজেপির একজনও মুসলিম সাংসদ নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একজনও মুসলিম সদস্য নেই। বেশ কয়েক বছর ধরে বিতর্ক চালানোর পর ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। ধর্মীয় বিধি নিয়ে বিতর্ক বাঁধিয়ে ২০১৯ সালে তিন তালাক আইন তৈরি করা হয়েছে। ওই বছরই কাশ্মীর উপত্যকার বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদানকারী অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর মুসলিমদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান বন্ধ করার জন্য নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ তৈরি করা হয়েছে। মুসলিমদের মনে নাগরিকত্ব হারানোর ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরির কথা বলা হয়। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তন করার কথা ঘুরেফিরে আসে। গোরক্ষার নামে বা গোমাংস খাওয়ার 'অপরাধে' নিরীহ মুসলমানদের মেরে ফেলা হয়। মুসলিমদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলা হয়, না বললে পেটানো হয়। হিন্দু পুরুষদের মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করতে উৎসাহিত করা হয়।মুসলিম প্রেমিক ও হিন্দু প্রেমিকার বিবাহ বন্ধনকে 'লাভ জেহাদ' তকমা দিয়ে প্রতারণা ও ধর্মান্তরিত করার অভিযোগে মুসলিম পুরুষটির জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হয়। সিনেমার সাহায্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম শাসকদের খুব খারাপ ভাবে চিত্রিত করা অথবা পুস্তক থেকে তাদের প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হয়। বিজেপির এই ধারাবাহিক মুসলিম বিরোধিতা ও বিদ্বেষের তালিকায় যুক্ত হয়েছে ওয়াকফ সম্পত্তি ও তার পরিচালনা পদ্ধতি সংক্রান্ত নতুন আইন।

হিন্দুত্ববাদী দল বা সরকার মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে যত সক্রিয় হবে মুসলিমবাদী সংগঠনগুলো তত সংগঠিত হওয়ার রসদ পাবে। হিন্দুত্ববাদীরা যেমন চেষ্টা করে হিন্দু জনগণের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে তেমনি মুসলিমবাদীরা চেষ্টা করে মুসলিম সমাজে হিন্দুদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি করতে। উভয়েই চায় হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে শত্রু মনে করুক। পরস্পরের প্রতি ঘৃণার ভাব উদ্রেক হোক। ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকরণ সৃষ্টি হোক। এরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করার বিরুদ্ধে। এরা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির বদলে সংঘাত বাধাতে চায়। ধর্মের নামে সংঘাত যত বাড়ে সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত রাখা ও শোষণ করা তত সহজ হয়। মেহনতি মানুষের রুটি রুজির সমস্যার গুরুত্ব নষ্ট হয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। দেশভাগ ও দাঙ্গায় প্রচুর মানুষের প্রাণহানি তারই নির্মম পরিণতি। মানুষকে ধর্মের নামে বিভাজিত করে শাসন ক্ষমতা ধরে রাখার নীতি বা কৌশল আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও অনুসৃত হচ্ছে। তাই সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির কথা মাথায় রেখে সরকার বা প্রশাসন যখন কোনো পদক্ষেপ নেয় তখন অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তার বিরোধিতায় সরব হওয়া। ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগকে সেই আলোকেই দেখতে হবে। আইনসভায় তৈরি করা আইন কিংবা বিচারব্যবস্থার বিচারের বাণীর চেয়েও বড় আমাদের বিবেক। সেই বিবেককে জাগ্রত রাখা জরুরি।

(লেখক মুর্শিদাবাদের কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

মোদিজীর আমলে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তলানিতে এসে ঠেকেছে

সৌর বসু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ বৈদেশিক রপ্তানি বাজার। ভারতবর্ষ ,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ সালে ৭৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। পরবর্তী বছর গুলিতে এই রপ্তানি এক ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম দফায় আমেরিকায় ক্ষমতা আসার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পরও সর্বত্র মোদী তাঁকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য ,ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর, তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদী আমন্ত্রণ পাননি। যদিও আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি , ইতালির প্রধানমন্ত্রী এল সালভাদরের রাষ্ট্রপতি এবং চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিঙ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এছাড়া ব্রাজিলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান বোলসোনারো আমন্ত্রিত ছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে আমন্ত্রণ না জানানোর কারণ কোন ইঙ্গিতবহ কিনা বলতে পারব না। পরবর্তীকালে নরেন্দ্র মোদী যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেছেন, ভারতের শুল্ক নীতির সমালোচনা করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ছাড়েননি। যদিও তিনি নরেন্দ্র মোদীকে তখনও তাঁর , ঘনিষ্ঠ সুহৃদ বলে অভিহিত করেছেন ।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর তাঁর 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' বা মেগানীতির উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরপরিণতি হিসেবেট্রাম্প বিভিন্নদেশের উপরসুউচ্চহারেশুল্কধার্যকরেন। বিশেষ করে চীনের উপর তিনি ১৪০ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেন।এ ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন দেশের উপর চড়াহারে শুল্ক চাপান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে শুল্কহারের পরিবর্তন করতে চাইছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ভারত থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী , বাণিজ্যমন্ত্রী বহুবার আমেরিকা সফর করেছেন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য।। তৎসত্বেও সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে ভারতের আমদানিকৃত পণ্যের উপর আমেরিকাকে ২৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। ইতিপূর্বে এই শুল্কের হার ছিল ১০ শতাংশ। এছাড়াও ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে রাশিয়া থেকে তেল এবং সামরিক সরঞ্জাম আমদানির জন্য ভারতকে জরিমানা দিতে হবে।। এই বিশাল হারে শুল্ক স্থাপনের ফলে আমেরিকাতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য মার খাবে। ভারত আমেরিকাতে টেক্সটাইল দ্রব্য বা গৃহস্থালী পোশাক, ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম তামা,গহনা প্রভৃতি রপ্তানি করে থাকে।

নতুন শুল্ক কার্যকর হলে আমেরিকাতে ভারতের রপ্তানি ৩০ু কমে যাবে বলে গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ সেন্টার আশঙ্কা করছে। ভারতের প্রতিযোগী দেশগুলি ভিয়েতনাম , বাংলাদেশ বা কম্বোডিয়া আমেরিকার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের শুল্ক কমাতে সক্ষম হয়েছে । চিনও মার্কিন দেশের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ভারতের উপর এখনো শুল্কের খাড়া ঝুলছে। তার ফলে রপ্তানির ময়দানে ভারত প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।

ভারতের এই অবস্থা কিভাবে হলো এবং ভারতের পরবর্তী কর্তব্য কি হতে পারে সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে এবং নানা মত বেরিয়ে এসেছে।

প্রকৃতপক্ষে ৯০ দশকের শেষ থেকে নরসিংহ রাও , বাজপেয়ী এবং মনমোহন সিং এর আমলে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের উন্নতি হতে শুরু করে। মনমোহন সিং তদানীন্তন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের সঙ্গে আলোচনাক্রমে নিউক্লিয়ার ডিল সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদি ও ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে গেছেন। বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম দফায় ক্ষমতায় আসার পর দুজনের মধ্যে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ২০১৯ সালে Houston এ নরেন্দ্র মোদী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প একই মঞ্চ থেকে ভারত ও আমেরিকার শক্তিশালী সম্পর্ক এবং কুশলী অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে ২০২০ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প সপরিবারে নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রনে ভারত সফরে আসেন।। আমেদাবাদে একই মঞ্চ থেকে নরেন্দ্র মোদী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার কথা ভারতীয় জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এরপর থেকে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়, ডোনাল্ড ট্রাম্প নরেন্দ্র মোদিকে সর্বত্র বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন।

কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বন্ধুকেও তীর্যক মন্তব্যে বিদ্ধ করা যায় সেটা সম্প্রতি আমরা দেখেছি। অতি সম্প্রতি তিনি ভারতবর্ষ এবং রাশিয়ার অর্থনীতিকে মৃত অর্থনীতি বলে উল্লেখ করেছেন। নরেন্দ্র মোদী বন্ধুর তির্যক মন্তব্যের কোন প্রত্যুত্তর দেন নি। এই নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায আসার পর নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন দূত পাঠাচ্ছেন আমেরিকাতে বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনার জন্য। ভারত সরকারের এই উদ্যোগের প্রত্যুত্তরে , ভারতকে কেবল ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকি শুনতে হয়েছে। এই হুমকি উপর্যপুরি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ কি নরেন্দ্র মোদি বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা !

পশ্চিম এশিয়ায় গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলের বর্বরোচিত আক্রমণ অব্যাহত আছে। সিরিয়াতে আসাদ সরকারের পতন হয়েছে। ইসরাইল ইরান আক্রমণ করেছে।লেবানন ইয়েমেনেও ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধের কোন নিষ্পত্তি হয়নি। ইরানের উপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা থাকাকালীন ভারত ইরান থেকে তেল সংগ্রহ করে আমেরিকার

চক্ষুশূল হয়েছে। ইউক্রেন -রাশিয়ার যুদ্ধে ভারতের অবস্থান নিয়ে আমেরিকা অসন্তুষ্ট। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে এবং তা যুদ্ধে পরিণত হয়। চারদিনের এই যুদ্ধের, নিষ্পত্তির কারণ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় । ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন যে তার মধ্যস্থতায় এই যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়। পাকিস্তান ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দাবীর সঙ্গে সহমত পোষণ করে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দাবির বিরুদ্ধে নিরুত্তর থেকে বুঝিয়ে দেন যে তিনি সহমত পোষণ করছেন না। প্রশ্ন উঠেছে , তাহলে ভারত হঠাৎ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি করলো কেন ?

ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুদ্ধের পর পাকিস্তান সরকার ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন জয় করতে সমর্থ হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শালকে লাঞ্চ এ আমন্ত্রণ জানান। সম্প্রতি পাকিস্তানের তেল খননের কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করতে সম্মত হয়েছে। ভারতের প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প যে যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হয়েছেন তার প্রমাণ মিলেছে ট্রাম্পের একটি তির্যক মন্তব্যে। সম্প্রতি ট্রাম বলেছেন হয়তো একদিন দেখা যাবে পাকিস্তান ভারতকে জ্বালানি সরবরাহ করছে। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কিছুটা উন্নতি হয়েছে। চীনের উপর আরোপিত শুল্ক হার অনেকাংশে হ্রস পেয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ব্রিটেন , জাপান সহ আরো কিছু দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন যে এপ্রিল মাসে যে শুল্কের হার ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, ব্রিটেন সহ অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে সেই সুল্কের হার হ্রাস পাবে ।

অন্যদিকে সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর ২৫% অতিরিক্ত শুল্ক আরোপিত করার কথা ঘোষণা করেছেন। দীর্ঘ কাল নিশ্চুপ থাকার পর নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি মুখ খুলেছেন। অতিরিক্ত শুল্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ,কোনভাবেই তিনি ভারতের কৃষকদের স্বার্থ বিসর্জন দেবেন না। ভারতের বিদেশ সচিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ কে অন্যায় এবং অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেছেন ।

যে কথাটা অনেকদিন আগেই বলা উচিত ছিল , আজকে যখন বিপদ ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে ,নরেন্দ্র মোদি নড়েচড়ে বসেছেন। এতদিন তিনি তার স্বঘোষিত ও আরোপিত বিশ্বগুরু ভাবমূর্তি লালন পালন করছিলেন। কয়েক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির অহম বোধ তার বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাস্তবিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতি আজ তলানীতে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং এর মিডিয়া উপদেষ্টা ডঃ সঞ্জয় বাড়ু করন থাপারের সঙ্গে একটি কথোপকথনের সময় বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ,চিন এবং পাকিস্তানের পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক সমীকরণ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। বর্তমানে চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সমীকরণ ভালো। শুল্ক নীতির ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।। তার ফলে তিনি মনে করেন, মোদিজীর আমলে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সর্বনিম্নস্থানে এসে পৌঁছেছে।

চাকরি থেকে কর্মসংস্থান

শুভ্রাংশু কুমার রায়

ভূমিকা : স্বর্গ বা নরকে কোনো চাকরি নেই কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। চিত্রগুপ্তকে যম মাস মাইনে দিতেন কিনা জানা নেই। মাঝে পৃথিবীতে ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টি থেকে শ্রমের বিভাজন একদা এমন হল যে সম্পদশালীর হয়ে শ্রম করলে তবে সেই সম্পদহীন শ্রমিক তার জীবনধারণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের উপকরণ পেতেন। সেই চাকরি প্রথার শুরু। তখন চাকর অনেকটাই দাস। ইতিমধ্যে ভক্ত ভগবানের দাস, প্রেমিক প্রেমিকার দাস হয়েছেন। সে অন্য কথা। কিন্তু অব্রাহ্মণ রাজা থেকে প্রজা সবাই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দাস থেকে ভারতে গণ্ডগোলের শুরু। সেই সংক্রমণে ভুক্তভোগী কেন্দ্র ভারত, অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলা। বর্তমানে অশিক্ষিত রাজনৈতিক শাসক দলের মন্ত্রীনেতাদের দাস হয়ে যাচ্ছেন সরকারি আমলারা। এরা ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সামান্য কয়েকজন সরকারি চাকুরীজীবী। বিরোধীরা এদের দলদাস বলে। শ্রমের মর্যাদা চুলোয় যাচ্ছে। একদা শিক্ষিত এবং এগিয়ে থাকা পশ্চিমবাংলা এখন সবথেকে বেশি ভুক্তভোগী। আর এই ফাঁকে ঘূণপোকার মতো বাসা বাঁধল চাকরির প্রতিশধ 'কর্মসংস্থান' যার কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র নেই।

চাকরি : মণ্ডল কমিশন লাগু হওয়ার আগে পশ্চিমবাংলায় সামাজিক ভাবে সবথেকে পিছিয়ে পড়া হিন্দু সমাজে চর্মকার, কুম্ভকার, ডোম, কর্মকার, মেথর ইত্যাদি পেশা মোটামুটি সংরক্ষিত ছিল। বাকি অনগ্রসরের জন্য সংরক্ষণ তেমন সমস্যা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এও ঘটনা, বাংলায় অজস্র সমাজ সংস্কারক মনীষী জন্ম নিলেও, অনেক মতাদর্শ আলোড়িত করলেও শিক্ষার আলো সর্বত্র সমান ভাবে পৌঁছয়নি। কিছু ঘটনা অপ্রত্যাশিত ছিল। এক, সাচার কমিটির রিপোর্টে (২০০৬) পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজে সংরক্ষণের অধিকারের দাবি। দুই, মতুয়া সমাজের দাবি। তিন, উত্তরবঙ্গ বিভাজনের দাবি। চার, ২০১০ সালে শাসক সরকারে পরিবর্তন। অন্ধকার আগে ছিল, এবার প্রকাশ্যে এল। রাজনীতির জট আরও পাকাল।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প ও পরিষেবার নতুন সাহসী ব্যতিক্রমী ভাবনা শুরুর আগেই ধ্বংস হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ১৯৯০-উদার নয়া অর্থনীতির চাপে সরকারি ক্ষেত্র তথা চাকুরি সঙ্কুচিত হতে শুরু

করেছে। চাকুরির আঙ্গিক ও চরিত্র বদলাতে শুরু করেছে অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও। অথচ পড়ে পাওয়া চোদ্দআনা নতুন সরকার টিকিয়ে রাখতে হবে। এর আগের সরকারে জন্ম নেওয়া ঠিকাদারের উত্তরসূরীরা রঙ পালটে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিল। ক্ষমতাবানেরা পেল সিন্ডিকেট, তোলা, সম্পদ লুঠের অধিকার। অপেক্ষাকৃত নিরীহদের চাকরির জায়গায় বিকল্প পুনর্বাসন দেওয়া শুরু হল 'কর্মসংস্থান'-এর মাধ্যমে। কেন্দ্র রাজ্য এখন চাকরি দেওয়ার নাম করে না। সরকারি বাজেটে অস্থির অনির্দিষ্ট কর্মসংস্থান পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ : সরকারি কাজের জায়গায় সংরক্ষণ প্রক্রিয়া জোরদার করার পর সরকারি চাকুরি আরও সীমিত এবং দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে অপরিহার্য ভেবে ব্যাপক সংস্কারে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে। নির্মম অভিজ্ঞতা, পশ্চিমবঙ্গে কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্কৃতি অবহেলিত। দক্ষ কর্মী, মেধাবী শিক্ষিত মানুষ পশ্চিমবাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কেউ পরিযায়ী হয়ে, কেউ পাকাপাকি অন্যত্র বসবাস শুরু করে। নিরুপায় অন্য মানুষ বিভিন্ন অদক্ষ অপ্রচলিত অসংগঠিত পথে দিন গুজরান করছেন যেখানে কাজের সুরক্ষা খুব কম। এখানে চুঁইয়ে পড়া অর্থনৈতিক অনুদান দিয়ে আরও অকর্মণ্য করে তোলা হচ্ছে কর্মক্ষমতাকে।

পরিসংখ্যান : ভারতে GSDP অনুযায়ী চতুর্থ স্থানে পশ্চিমবঙ্গ (১৭.২ লক্ষ কোটি)। মাথা পিছু আয় পঞ্চমস্থানে বছরে ১,৫৫,০০০ টাকা (প্রায়)। খুব খারাপ বলা যাচ্ছে না। ২০২৩-২৪ বাজেট ও সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী GDP-তে রাজ্যের মোট উৎপাদন পণ্য-পরিষেবার আর্থিক মান ক্ষেত্র অনুযায়ী অনুপাত (শতকরা অঙ্কে) সঙ্গে বন্ধনী মধ্যে ভারতের সংখ্যাতত্ত্ব দেওয়া হল। (GDP Gross Domestic Product. GSDP- Gross State Domestic Product).

কৃষি ১২-১৪ (১৫-১৮),

শিল্প ২০-২২ (২৫-২৭)

পরিষেবা ৩৩-৬৬ (৫৩-৫৫)

আর কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে শ্রম-জরিপ অনুযায়ী অনুপাত; কৃষি ৩৫-৪০ (৪২.৪৫), শিল্প ২০-২৫ (২৫-২৭) ও পরিষেবা ৩৫-৪০ (৩০-৩২)। ভারতে সামগ্রিক বেকারত্বের হার ৫.৬। পশ্চিমবঙ্গ তুলনায় ভাল ২.২। সকার ও বেকার সংখ্যাতত্ত্ব নির্ধারণে আর একটি নতুন উদ্যোগ চালু হয়েছে; পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (Periodical Labour Force Survey)। এটি জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (National Statistical Office) পরিচালিত ভারতের কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের আধুনিক পদ্ধতি। জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস SNSOV পরিচালনা করে। সোজা কথায় ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে কত শতাংশ ব্যক্তি কাজ করছেন অথবা সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজছেন (Labour Force Participation Rate), শ্রমিক-জনসংখ্যা অনুপাত; বেকারত্বের হার ইত্যাদি দিয়ে নতুন ভাবে অঙ্ক কষা হয়। এখান থেকে শ্রমবাজারের একটা ছবি পাওয়া যায়। অর্থাৎ কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের আর এক পদ্ধতির বাস্তব ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান। চাকরি দিতে না পেরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নানা প্রকল্পে কর্মসংস্থান ক্রমশ বাড়াচ্ছে। LFPR ভারতে ৫৭.৯, পশ্চিমবঙ্গে ৫১.১।

বিশ্বব্যাঙ্কে 'পভার্টি অ্যান্ড ইকুইটি ব্রিফস' অণু রিপোর্টে (এপ্রিল'২৫) ভারতে চরম দারিদ্র অনেকটাই কমেছে। অকৃষি ক্ষেত্রে মাত্র ২৩ কাজ সংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায়। ভারতে ভোগভিত্তিক গিনি সূচক (আয় বা সম্পদের বণ্টনের সমতা/অসমতা সূচক) ০.৫২ (২০০৮) থেকে ০.২৮ (২০১২-১৩)। অর্থাৎ ভোগ বৈষম্য মাঝারি মানের। নেপথ্যে গোপন রইল, এর কারণ ভারতের দারিদ্র উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে গরিব মানুষের হাতে নগদ টাকা, সস্তায়/বিনামূল্যে চাল বিতরণ ইত্যাদির ফলে প্রকৃত কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মবিমুখতা, কর্মশক্তির অবক্ষয় বাড়ছে, আত্মনির্ভর মর্যাদাপূর্ণ ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, প্রকৃত মানবসম্পদের বিকাশ বাধা পাচ্ছে। তাও আবার সুষম বণ্টনের অভাবে অপচয় হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ইনকাম ইকুয়ালিটি ডেটাবেসে তাই ভারতে দারিদ্রের পরিসংখ্যান বেদনাদায়ক, গিনি সূচক ০.৫২ (২০০৪) থেকে বেড়ে হয়েছে ০.৬২ (২০২৩)। সমালোচনা উঠেছে পরাধীন ব্রিটিশ রাজের থেকে স্বাধীন বিলিওনিয়ার রাজে দুরবস্থা বেশি। লন্ডনের সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাম্যের নিরিখে বিশ্বে ২১৬টি দেশের মধ্যে ভারত ১৭৬ তম (২০০৯ -১১৫ তম) স্থানে। পশ্চিমবঙ্গ অজুহাত দিতেই পারে, বাকি ভারত আরও খারাপ। কূটতর্কের অসীম ক্ষমতা।

এই সংখ্যাতত্ত্বে অধিকাংশ জায়গায় ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মিল আছে। বিশ্বে ভারত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল হলে পশ্চিমবাংলাও তাই। কিছু জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা গড় ভারতের থেকে ভাল। কিন্তু পরিসংখ্যান সব কথা বলে না। বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না। অর্থাৎ হয় পরিসংখ্যানের অঙ্কের তথ্যসূত্র ভুল অথবা গোটা পদ্ধতিতে কারসাজি আছে।

পরিসংখ্যানের বাইরে বাস্তব ছবি : চতুর্বর্ণ প্রথায় শূদ্র ও দাস ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শাসক রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে ও তাদের অনুপ্রেরণায় টিকে থাকার স্বভাব-চরিত্র দেখে পাগলা দাশুর মতো বলতে ইচ্ছা করে; আবার সে আসিল ফিরিয়া। বিনাশ্রমে বিনাব্যয়ে বুঝে-বা না-বুঝে (সরকারি রাজকোষ থেকে) সামান্য কিছু পেলেই ভোটযন্ত্রে বিনাশ্রমে শাসকের পক্ষে ভোট পড়ে যায়। পরপর নিরঙ্কুশ আধিপত্যে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি পায় চাকরি থেকে কর্মসংস্থানের এই রূপান্তর যা আগামী দিনে অবৈধভাবে সুযোগপ্রাপ্ত মানুষকে কর্মনাশার অন্ধকূপে ফেলছে। নব কলেবরে শূদ্র-দাস প্রথার এ কালের কর্মসংস্থাপনায় সম্ভবামি অন্ধকার যুগে যুগে।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতা ও ১৯৫০-এ সংবিধান; ভারতে অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অনুশীলন, নীতি ও

প্রয়োগের গঠন এবং চরিত্র বদলে দিয়েছে। সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছে শ্রমব্যবস্থা। স্বাধীন জনগণের কাছে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র ও সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও সরকার নতুন বিষয় যাদের কাউকে চোখে দেখা যায় না। বিমূর্ত এই ব্যবস্থাকে কাজের মাধ্যমে বোঝা যায়। কাজের অস্তিত্ব শ্রমে। আর সেখানেই যত অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা। আপনি আচরি ধর্মে দেখা যাচ্ছে, বাড়ির কাজে ব্যক্তি-মালিক দিনমজুর শ্রমিকের প্রতি নিখুঁত শ্রম, সর্বাধিক উপযোগিতা ও সবথেকে কম মজুরিদান প্রত্যাশা করে। আবার তিনি যখন সরকারি কাজে নিজে শ্রমিক হয়ে কাজ করেন তখন সে অর্থ নীতি শাস্ত্র উলটে যায়। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত শ্রম, প্রয়োজনীয় শ্রম, উদ্বৃত্ত শ্রম ইত্যাদির গঠন চরিত্র ইত্যাদির রূপান্তর হয়। সমাজে এই অংশ থেকে সুস্থ সুষম সর্বজনীন শ্রমব্যবস্থার নেতৃত্ব দিলে গোড়ায় গলদ থেকে যায়। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে বর্তমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্ব। এই জায়গাও উলটে যাচ্ছে। ক্রমশ সরকারি আইন-শাসন-বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি মন্ত্রী, আমলা ও তাদের প্রশ্রয়ে সদস্য সমর্থক সমাজের দায় হয়ে উঠেছে। এরাই ইচ্ছেমতো চাকরি তৈরি করছেন, নষ্ট করছেন। ফের শূন্যস্থান পূরণ করছেন কর্মসংস্থানের গোঁজামিল দিয়ে। কাজের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে।

ধরা যাক এই রাজ্যে অধিকাংশের হাতে কাজ আছে। অনেকে শ্রমনির্ভর উৎপাদন কাজে ও ব্যবসায় ব্যস্ত। কৃষি শিল্প পরিষেবা ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটছে। তাহলে ধর্ষণ, লুট, অবৈধ নানা কাজ কারা করছে? ধর্ম, সম্প্রদায়ের নামে নিজেদের মধ্যে হিংসা, হিংস্রতার রাজনীতি কখন করবেন? যে কোনো দেশের প্রাথমিক পরিচয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। বিরোধীদের অভিযোগ, পরিকল্পিত ভাবে হচ্ছে এই ধ্বংসযজ্ঞ। দুর্বল অশিক্ষিত আগামী প্রজন্ম যাতে কিছুতেই মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের স্বঘোষিত দাবি, ভারতে সবথেকে এগিয়ে এই রাজ্য। কর্মসংস্থানের জটিল জালিয়াতিতেও এগিয়ে আছে এই রাজ্য। জ্বলন্ত প্রমাণ সরকারের আত্মপক্ষ সামলাতে সর্বক্ষণ নিম্ন থেকে উচ্চ আদালতে জনগণের করের অর্থ অপচয়ে ছোটাছুটি। সরকারি সাধারণ কর্মীরা মাইনের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ।

ইয়োর্স ফেথফুলি : ইংরেজ শাসনকালে সরকারিভাবে 'সরকারি চাকরি' শধের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়। সেকালে Government service বা সরকারি চাকরির আলাদা কদর ছিল। ব্রিটিশ আনুগত্যের মধ্যে একটা ইংরেজ মালিকানার ছোঁয়া আত্মতৃপ্তি দিত। আশ্চর্য ব্যাপার Service বাংলায় সেবা বা পরিষেবা, শুনতে ভাল। কিন্তু servant মানে চাকর। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে ভগবানের ভৃত্য দাস হওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের চাকর মোটেই ভাল লাগে না। বাংলার জমিদাররা ইংরেজদের চাকর ছিলেন না যদিও রায়বাহাদুর ইত্যাদি খেতাবের জন্য কিছুক্ষেত্রে বাঙালি জমিদার দাসেরও অধম ছিল।

'চাকরি' শব্দ এভাবে মর্যাদাসম্পন্ন বৃত্তি হয়ে গেছে সমাজে ১৯০০ শতাধ থেকে। গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালি, বিশেষ করে হিন্দু বাঙালির উত্থানের কারণ আকর্ষণীয় পেশা এই চাকরি। লিখিত পেশাগত ভদ্রলোকের চুক্তি পারিশ্রমিক, সময়, দক্ষতা, অধিকার ও সুযোগ দিয়েছে। সংগঠন করার সুযোগ বা অধিকার অর্জিত হয়েছে পরাধীন ভারতে। কালক্রমে উৎপাদন ভেদে শ্রমের চরিত্র বদলালে চাকরির রকমফের হল। সরকারি চাকরি, বেসরকারি চাকরি, পার্ট-টাইম/ফুলটাইম চাকরি, চুক্তিভিত্তিক চাকরি ইত্যাদি। ১৯০০ শতাধের শেষে দেখা গেল বাজার অর্থনীতির দাপটে 'চাকরি' বিবর্তিত হয়েছে 'কর্মসংস্থানে'। চাকরি ক্ষেত্রে অর্জিত অধিকার কর্মসংস্থানে হারিয়ে গেল। সরকারি কর্মী সংস্থ্যা কমার সঙ্গে কর্মীদের সংগঠনশক্তি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান : স্বাধীনতার হস্তান্তর হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকের চেয়ারে সামনে বসেছে শাসক রাজনৈতিক দল। পিছনের আসনে কর্পোরেট সেক্টর। চাকরির আর সেদিন নাই, সুদিনও নেই। শ্রমিকের পক্ষে একদা পারিশ্রমিক, সময়, দক্ষতা, অধিকার, সুযোগ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। সংগঠন করার সুযোগ বা অধিকার বাজার অর্থনীতির মুনাফাসর্বস্বতা কেড়ে নিচ্ছে। বাজারের পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রমের যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন হয়ে চলেছে। পশ্চিমবাংলায় কাজের চাহিদা অনেক। কিন্তু দুর্বল অর্থনীতির জন্য কায়িক শ্রমের চাহিদা, অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে। এমন শ্রমের জোগানও বেশি। কারণ কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা দক্ষতার অভাবে এমন অপরিণত শ্রমিক ছেয়ে গেছে কাজের বাজারে। আদর্শহীন নীতিহীন বাজারের সব লক্ষণ স্পষ্ট এই রাজ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-শিল্প-পরিষেবা সব এখন স্বপ্ন সাধারণভাবে ন্যূনতম বেতন, কাজের ক্ষেত্রে সুরক্ষা, কাজের সুস্থ পরিবেশ, অবসরকালীন ভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়মনীতির প্রতি সরকারি নজরদারির অভাব প্রবল। সবমিলিয়ে এই বড় কৃষিক্ষেত্র চূড়ান্তভাবে অসংগঠিত এবং অদক্ষ। এখানে কর্মসংস্থানের কৌশলী প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক অংশ বিশেষ করে বয়স্করা ভিটেজমি ছেড়ে যেতে চাইছেন না। আর এক অংশ অল্পবয়সী কর্মঠ যুবক পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে দক্ষিণ পশ্চিম ভারত এমনকি পশ্চিম এশিয়ায় চলে যাচ্ছেন জীবন বাজি রেখে। এও একধরণের অসরকারি কর্মসংস্থান প্রকল্প। অথচ কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ করে আলু ধান আনাজ, বাগিচা ক্ষেত্রে চা, আম, আনারস, বরজে পান ইত্যাদির ফলন প্রচুর। মৎস্য ক্ষেত্রেও প্রচুর সম্ভাবনা। অথচ সুন্দরবন অঞ্চলে মৎসজীবী শ্রমজীবী মানুষ বিপন্ন। এসব ক্ষেত্রে উৎপাদকরা অসংগঠিত চাকরির ব্যবস্থা করতে পারছেন না। শ্রমজীবী মানুষ শাসক রাজনৈতিক দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর সামান্য অর্থের সাময়িক কর্মসংস্থানে কোনোরকমে টিকে আছে।

একজন ব্যক্তি তার জমি চাষ করছেন ট্রাকটর পাওয়ার-টিলার, কম্বাইন্ড হার্ভেসটরের মাধ্যমে। তিনি আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের সাহায্যে ড্রোনের মাধ্যমে কীটনাশক ছড়াচ্ছেন, ফসলের নজরদারি করছেন। তিনিই আবার তাঁর খামারে ধান, চাল, ভুট্টা নিজে ট্রাকে করে

নিয়ে যাচ্ছেন প্রক্রিয়াকরণের জন্য, প্যাকেজিং-এর জন্য। এই ব্যক্তিকে চাষী, ক্ষুদ্র শিল্পপতি বা পরিষেবা ক্ষেত্রের কর্মী কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ফেলা যাচ্ছে না। এরা কিছুটা অবস্থাপন্ন ও স্বনির্ভর। এঁরা সরকারের কর্মসংস্থানের ওপর নির্ভর করেন না। আজকের উন্নত কৃষিব্যবস্থার এরাই মানবসম্পদ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এমন স্বনির্ভর উৎপাদকের সংখ্যা খুব কম। হয়তো অধিকাংশ ভূমিসংস্কারের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াজাত ছোট ছোট জোতের জন্য। এজন্য পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কৃষিতে জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগ সীমিত, শিল্প-প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে। গ্রামে ছদ্মগুবেকার অনেক। উত্তরবঙ্গে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার থেকে সবথেকে বেশি মানুষ পশ্চিমবঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত মজুরি না পেয়ে বা অন্য রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিক, ধাতুশিল্প শ্রমিকের কাজে বেশি মজুরি পেয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সেই বাঙালির একাংশকে সাম্প্রতিক জনশুমারিতে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার উপক্রম হচ্ছে।

কৃষি-সহায়ক ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা কাজে লাগানো হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের ভারি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রাজ্যে ভরসা পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারি সভা, মেলা হচ্ছে। শিল্পপতিরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বাধ্য হয়ে। কিন্তু এগিয়ে আসছেন না। অধিকাংশ অকার্যকর থেকে যাচ্ছে। দীর্ঘসূত্রী হচ্ছে বা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিল্প-বাণিজ্য নীতি ব্যর্থ। খাস জমি পেয়েও ভারি শিল্প হচ্ছে না। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পিছিয়ে যাচ্ছে। একদা এই রাজ্যের অর্থকরী ফসল চা ও পাট শিল্পে উন্নত ছিল। শিল্পক্ষেত্রে বড় অংশে চাকরির অনেক সম্ভাবনা ছিল। সে জায়গা নষ্ট হতে শুরু করেছে ২০১০-পূর্ব সরকারের শেষ পর্বের অমনোযোগিতা ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য।

পরিষেবা শিল্পে কর্মীদের দূরবস্থা সামান্য কম। পারিশ্রমিক প্যাকেজ নির্ভর। দিনে আট ঘন্টার শ্রমের সীমা উধাও। সর্বদা ছাঁটাইয়ের আতঙ্ক। টার্গেট মেটাতে গিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় সহকর্মী শত্রু হয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাথ্য ভাল নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী স্বাস্থ্যকর্মী সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। পরিষেবা ক্ষেত্র অধিকাংশ অনলাইন নির্ভর। অনলাইনে ২৪ ঘন্টা নিরাপদ নয়।

উপায় : কর্মসংস্থানকে ফের চাকরি, স্বাবলম্বনযুক্ত কাজ, সুস্থ বাজারে ব্যবসা ইত্যাদিতে রূপান্তর করতে হবে। আপাতত ভরসা ভারতের আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থার কার্যকরিতা। আপাতত উপায় ভারতের সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকের নিম্নলিখিত অধিকার।

(১) শিক্ষার অধিকার যা মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১এ) যা ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের (২০০২ সালে) মাধ্যমে সংযোজিত হয়। এই সংশোধনের ভিত্তিতে ২০০৯ সালে 'বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকারের আইন' (RTE Act - Right to Education Act) চালু (১-৪-২০১০) হয়। এই আইনের প্রধান দাবি রাষ্ট্র ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের প্রতিটি শিশুকে বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার প্রদান করবে যা রাষ্ট্র আইন দ্বারা নির্ধারণ করবে। প্রতিটি সরকারি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুব্যবস্থা চাই।

(২) কাজের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৪১) যা সরাসরি মৌলিক অধিকার নয়। কিন্তু পরিচালনামূলক নীতিসমূহ (Directive Principles of (tate Policy)-এর অধীনে স্বীকৃত এবং পরোক্ষভাবে কিছু আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আইনের প্রধান দাবিঃ রাজ্য তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও উন্নয়নের সীমার মধ্যে থেকে নাগরিকদের কাজ, শিক্ষা ও জনসহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। রাষ্ট্র নাগরিকদের কাজের সুযোগ দেবে। বেকার, বৃদ্ধ ও অক্ষম নাগরিকদের সহায়তা করবে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক দাবি , সর্বত্র সুস্থ, স্বাস্থ্যকর, সুরক্ষিত, স্থায়ী ও সম্মানজনক কাজের পরিবেশ চাই।

(৩) বাঁচার অধিকার যা মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১)। প্রতিষ্ঠিত আইন আনুসারে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(৪) নাগরিকদের উপযুক্ত জীবিকার অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩৯-এ), জীবিকার ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত মজুরি ও শ্রমিকদের মর্যাদা নিশ্চিতকরণ (অনুচ্ছেদ ৪৩), জবরদস্তি শ্রম ও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ (অনুচ্ছেদ ২৩ ও ২৪)

শেষ উপায় গণতান্ত্রিক পথে নিজেকে শিক্ষিত করবেন শ্রমিক। এই অব্যবস্থায় বিস্তর অপ্রাপ্তির মধ্যেও উদাহরণ আছে আইনের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকের প্রাপ্য বকেয়া আর্থিক পাওনা কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করার।

কাশ্মীরে অরুন্ধতী রায় ও এ জি নুরানীর বই নিষিদ্ধ : মুক্ত চিন্তার ওপর আক্রমণ

আশিস গুপ্ত

জম্মু ও কাশ্মীর হোম ডিপার্টমেন্ট সম্প্রতি এক আদেশে অরুন্ধতী রায়, এ জি নুরানি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকের লেখা ২৫টি বইয়ের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেছে। লেফটেন্যান্ট-গভর্নর মনোজ সিনহার নির্দেশে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, এই বইগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদদ প্রচার করে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে একটি মিথ্যা আখ্যানদ তৈরি করে। সরকার জানিয়েছে, এই ধরনের সাহিত্য তরুণদের মনে 'অভিযোগ, ভিকটিমাইজেশন এবং সন্ত্রাসী বীরত্ব'-এর সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে

পারে।বিজ্ঞপ্তিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, এই বইগুলো ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃত করে, সন্ত্রাসীদের মহিমান্বিত করে, নিরাপত্তা বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে, ধর্মীয় মৌলবাদকে উৎসাহিত করে এবং সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের দিকে পরিচালিত করে। সরকারের এই পদক্ষেপের আইনি ভিত্তি হিসেবে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩-এর ১৫২, ১৯৬, ১৯৭ ধারা এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর ৯৮ ধারাকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারাগুলোর অধীনে, সরকার এই বইগুলোর প্রকাশনা এবং কপি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছে।নিষিদ্ধ হওয়া বইগুলোর সম্পূর্ণ তালিকা নিচে দেওয়া হলো, যেখানে এ জি নুরানির মতো বিখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞের লেখা 'দ্য কাশ্মীর ডিসপিউট ১৯৪৬-২০১২', সুমন্ত্র বোসের 'কাশ্মীর অ্যাট দ্য ক্রসরোডস' এবং অরুন্ধতী রায়ের 'আজাদি'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে Human Rights Violations in Kashmir - পিওতর বালসেরোভিচ এবং অ্যাগনিয়েস্কা কুসেভস্কা জ্জashmiris Fight for Freedom - মহম্মদ ইউসুফ সারফColonizing Kashmir StateéôéBuilding under Indian occupation - হাফসা কানজওয়ালKashmir Politics and Plebiscite - ড. আধুল গোকহামি জব্বার Do You Remember Kunan Poshpora? - এসসার বাতুল ও অন্যান্য Mujahid ki Azan - ইমাম হাসান আল-বানা শহীদ Al Jihadul fil Islam - মাওলানা মওদুদি Independent Kashmir - ক্রিস্টোফার স্নেডেন Resisting Occupation in Kashmir - হেলি ডুশিনস্কি, মোনা ইন ভাট, আথার জিয়া এবং সিনথিয়া মাহমুদ Between Democracy & Nation Gender and Militarisation in Kashmir - সীমা কাজী Contested Lands - সুমন্ত্র বোস In (earch of a Future The Story of Kashmir - ডেভিড দেভাদাস Kashmir in Conflict India– Pakistan and the Unending War - ভিক্টোরিয়া স্কোফিল্ড The Kashmir Dispute ১৯৪৭-২০১২ - এ জি নুরানি Kashmir at the Crossroads Inside a ২১শ্চ Century Conflict éôé ¢%›sþf õîy¢A Dismantled State The Untold Story of Kashmir after Article ৩৭০ - অনুরাধা ভাসিনResisting Disappearance Military Occupation & Womenós Activism in Kashmir আথার জিয়াConfronting Terrorism - মারুফ রাজা (সম্পাদিত) Freedom in Captivity Negotiations of belonging along Kashmiri Frontier - রাধিকা গুপ্ত Kashmir The Case for Freedom তারিক আলি, হিলাল ভাট, আংগনা পি. চ্যাটার্জি, পঙ্কজ মিশ্র ও অরুন্ধতী রায় Azad- অরুন্ধতী রায় USA and Kashmir - ড. শামশাদ শানLaw & Conflict Resolution in Kashmir - পিওতর বালসেরোভিচ এবং অ্যাগনিয়েস্কা কুসেভস্ক Tarikh Siyasat Kashmir - ড. আফা,,þKashmir & the future of South Asia - সুগত বোস ও আয়েষা জালাল (সম্পাদিত) এই পদক্ষেপটি সাহিত্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। সরকার যেখানে এই বইগুলোকে তবিচ্ছিন্নতাবাদীদ আখ্যা দিয়েছে, সেখানে সমালোচকদের মতে এই বইগুলো মূলত একাডেমিক, ঐতিহাসিক এবং সাংবাদিকতামূলক পর্যবেক্ষণ যা কাশ্মীরের জটিল পরিস্থিতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরে। বিখ্যাত এবং আন্তর্জাতিক লেখকদের রচনা নিষিদ্ধ করা সম্ভবত আলোচনার পথ রুদ্ধ করে এবং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আখ্যান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই নিষেধাজ্ঞা কেবল বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়েই নয়, বরং মুক্ত চিন্তা ও বহুমাত্রিক আলোচনার অধিকার নিয়েও গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী)

শতবর্ষে সুকান্ত

কবি সুকান্ত যার কলম কাঁদত শোষিতদের জন্য

সুদর্শন নন্দী

একুশ বছরের জীবন। যে বয়সে অন্য কবিরা হয়তো লেখালিখিও শুরু করেননি অথচ সেই বয়সে সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে মাত্র ছয় সাত বছর লেখালিখি করে বাংলা সাহিত্যের আসনটি শুধু পাকা করেন নি, বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষগুলির হৃদয়েও চিতিয়ে আসন পেতেছেন যা বেশ ব্যতিক্রম। কবি নজরুলকে আমরা বিদ্রোহী কবি বলি। সেই বিদ্রোহ যেমন অন্যায়,শোষণ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তেমনি সুকান্তকে আমরা বলি প্রতিবাদী কবি।

কিসের প্রতিবাদ? ব্যক্তিগত লাভের জন্য প্রতিবাদ? না। এই প্রতিবাদ নিজের জন্য নয়, নিরন্নের জন্য, নিঃস্বের জন্য। এই প্রতিবাদ সেই প্রতীকী মোরগের জন্য, যে খাবারের জন্য অট্টালিকার ভেতর রাশি রাশি খাবার থেকে উদরপুরণের প্রত্যাশা করে আর বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায় খেতে নয়, খাবার হিসেবে। এই ভাবনা সেই হতভাগ্য রানারের জন্য যে উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করে এবং টাকার বোঝা নিয়ে গেলেও সেই অর্থ তার ছোঁয়া চলে না। এই প্রতিবাদী কবি লিখেছেন তাঁদের যন্ত্রনার কথা যারা এদেশে জন্মে পদাঘাত শুধু পেল। লিখেছেন উলঙ্গ শিশুটির কথা।

ছয় সাত বছরে যথাসম্ভব নিংড়ে দিয়ে গেছেন তিনি মানব মুক্তির জন্য, পরাধীনতার শেকল ভাঙ্গার জন্য, শোষণের বিরুদ্ধে, শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য।

জন্ম ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট তার মাতামহের বাড়িতে কালীঘাট, কলকাতায়। বাবার প্রকাশনী ব্যবসা। সারস্বত লাইব্রেরীর

স্বত্বাধিকারী, যেটি ছিল একাধারে বইয়ের প্রকাশনা ও বিক্রয় কেন্দ্র। স্বল্প জীবনে মৃত্যুশোক তাঁকে গ্রাস করেছিল। অতি প্রিয় ও আদরের জেঠতুতো বোন রাণীদি এবং মা মারা গেলেন। সেই থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন, কবিতাই হয়ে উঠল সঙ্গী। মর্নিং সোস দ্য ডে, সকাল দেখে বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে। তেমনি শৈশবেই সুকান্তের সাহিত্যানুরাগ স্পষ্ট হতে থাকে। তার প্রথম ছোটগল্প ছাপা হয় বিদ্যালয়েরই একটি পত্রিকা-'সঞ্চয়' এ। শিখা পত্রিকায় সেসময় প্রায়ই সুকান্তের লেখা ছাপা হতো। এগার বছর বয়সে 'রাখাল ছেলে' নামে একটি গীতি নাট্য রচনা করেন। এটি পরে তার 'হরতাল' বইতে সংকলিত হয়।

বাগবাজারের কমলা বিদ্যামন্দিরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হন। এ সময় ছাত্র আন্দোলন ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ায় তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। ১৯৪৪ সাল থেকেই তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মাধ্যমে। ১৯৪৪ সালেই 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এর প্রকাশনায় তিনি 'আকাল' নামে একটি সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন। তাঁর মতাদর্শের ভিত্তিতেই অর্থাৎ সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় স্ফুরিত হয় তাঁর অক্ষর-জীবন। সেই অক্ষর জীবনের মুল লক্ষ্যই লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্তের মুখে রুটি তুলে দিতে। নিরন্নের এই ক্ষুধার্তবোধ সুকান্তের হৃদয়ে এতো তীব্র হয়েছিল যে পূর্ণিমার চাঁদও হয়ে যায় বিবর্ণ। ক্ষুধার্তের চোখে সেই গোলাকার চাঁদ ঝলসানো রুটি হয়েই আটকে থাকে।

সুকান্ত দুঃখী-দরিদ্র সাধারণ মানুষকে নিয়ে লিখেছেন অধিকাংশ কবিতা। এছাড়া লিখেছেন রূপকধর্মী কবিতাও। বলেছেন বেদনার কথা বস্তুর রূপক-প্রতীকে। এসব কবিতার মধ্যে একটি মোরগের কাহিনী, কলম, সিগারেট, দেশলাই কাঠি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব কবিতার রূপকের আড়ালে প্রবল ভাবে লক্ষ করি কবির প্রতিবাদী চেতনা।

সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা দৈনিক স্বাধীনতার (১৯৪৫) 'কিশোর সভা' বিভাগ সম্পাদনা করেছেন। মার্কসবাদী চেতনায় আস্থাশীল কবি হিসেবে সুকান্ত কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান করে নেন। শোষণ, অন্যায়, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তার রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ছাড়পত্র (১৯৪৭), পূর্বাভাস (১৯৫০), মিঠেকড়া (১৯৫১), অভিযান (১৯৫৩), ঘুম নেই (১৯৫৪), হরতাল (১৯৬২), গীতিগুচ্ছ (১৯৬৫) প্রভৃতি।

স্বল্পায়ু জীবন ছিল তাঁর। ম্যালেরিয়া ও পরে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে মাত্র ২১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন মাত্র ২১ বছর। শেষ হয়ে গেল এক প্রতিবাদী কলম যে কলমে সুকান্তই বলতে পারেন এ বিশ্বকে নবজাতকের বাসযোগ্য করে যাবেন তিনি, সূর্যকে বলতে পারেন, হে সূর্য তুমি ত জানো আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব !, সিগারেটের প্রতীকে হুঁশিয়ারি দিতে পারেন-হঠাৎ জ্বলে উঠে বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে মারতে, যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছ এতকাল। ('জলদর্চি'র সৌজন্যে)।

বিশ্বকবির তিরোধানের দিন শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ দিবস

অরবিন্দ দাস

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে ২২ শে শ্রাবণ ১৩৪৮ (ইংরাজি ৭ অগস্ট, ১৯৪১) বেলা ১২-১০ মিনিটে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। কবির শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী দেহ শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত করা যায়নি। কলকাতায় শবদেহ নিয়ে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। কলকাতার নিমতলা ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। রথীন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকায় কবির মুখাগ্নি করেন সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্র সুবীরেন্দ্রনাথ। ২২ শে সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবির উদ্দেশে বিশেষ প্রার্থনাসভা হয়। আচার্য নন্দলালের তত্ত্বাবধানে সভাস্থল সজ্জিত হয় এবং শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

একজন মনীষীর মৃত্যুদিন উদযাপনের অর্থ হচ্ছে শিখা থেকে শিখা প্রজ্জ্বলন। মানুষ মরণশীল কিন্তু সৃজনশীল রবীন্দ্রনাথ তো মৃত্যুহীন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াণ দিনটিতে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ দিবস হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। আসলে বৃক্ষ হচ্ছে আদি প্রাণ। বৃক্ষরোপণ হচ্ছে নবজীবনের প্রতীক। সুতরাং একই দিনে দু'টি অনুষ্ঠান পরিপূরক।

কবির সারা জীবনের কাজকর্মকে স্মরণ এবং বৃক্ষের মত নবজীবনকে বরণ। কবির মৃত্যুদিনকে চিহ্নিত করণের ভিত্তিটি শুধু নবজীবনের উদ্বোধন নয় আরও ব্যাপক ও গভীর। এর কারণ খুঁজতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্কটা বুঝতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন প্রকৃতির সহায়তা ছাড়া জীবনলাভ ও জীবনযাপন কোনোটাই সম্ভব নয়। বৃক্ষের কাছেই মানবজাতি সবচেয়ে বেশি উপকৃত। কারণ তার কাছ থেকে পাই পত্র, ফুল, ফল, ছায়া, ওষুধ তৈরির উপকরণ, রস, সার, কাঠ, সর্বোপরি বেঁচে থাকার আসল উপকরণ অক্সিজেন। তাই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে স্থাপিত করেছিলেন প্রকৃতির মাঝখানে যেখান থেকে শিশু বেড়ে উঠবে এবং প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখবে। এছাড়া কবি তাঁর পাঠশালার পাঠ্যক্রমে প্রকৃতিকে বড়ো স্থান দিয়েছিলেন। প্রচুর গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন যার মধ্যে প্রকৃতি পাঠের পরিচয় ছিল অর্থাৎ কোন ঋতুতে কোন ফুল ফুটে ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ সূচনা হয় ১৯২৫ সালে কবির ৬৫তম জন্মদিবসে। উত্তরায়ণে পঞ্চবটী অর্থাৎ অশ্বত্থ বট, বেল, অশোক ও আমলকী গাছ লাগিয়ে। কিন্তু ঋতু উৎসব হিসেবে এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় আরো তিন বছর পর।

১৯২৬ সালের একটি ছোটো ঘটনার কথা উল্লেখ করি। ১৯২৬ সালে নভেম্বর মাসে চিকিৎসকদের পরামর্শে হাঙ্গেরির বালাতন হ্রদের তীরে এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কবি বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি Linden tree-র চারা রোপণ করেন। এই বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে কবি লেখেন-

'হে তরু, এ ধরাতলে রহিব না যবে
সেদিন বসন্তে নব পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি পথিকেরে কবে
ভালোবেসেছিল কবি বেঁচেছিল যবে'

১৩৩২ সালের ২৫ শে বৈশাখ অর্থাৎ ১৯২৫ সালে যে বৃক্ষরোপণ হয় ওই সময় রবীন্দ্রনাথ ' মরুবিজয়ের কেতন উড়াও ' গানখানি লেখেন।

আনুষ্ঠানিক বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরু হয় ১৯২৮ সালের ১৪ জুলাই। বৃক্ষরোপণ হওয়ার পর সিংহসদনে একটি সভা হয়। ওই সভায় ছটি কবিতা পাঠ করেন সেগুলি পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম) এর উদ্দেশ্যে রচিত। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ সদ্য লেখা 'বলাই' গল্পটি পড়ে শোনান। বাল্যকালে উদ্ভিদ জীবনের প্রতি কবি হৃদয়ের যে ভালোবাসা ছিল তা তিনি বলাই গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। গাছকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমাদের 'বোবা বন্ধু'। 'নীলমণিলতা' কবিতাটি যেন এক বোবা বন্ধুর সঙ্গে আলাপচারিতা, বনবাণী কাব্যগ্রন্থের ২০টি কবিতার মধ্যে ১৫টি কবিতাই বৃক্ষবিষয়ক। বনবাণী রচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উপলব্ধির সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটেছিল। জগদীশচন্দ্র কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষ ভাবনা নিয়ে লেখা। বৃক্ষরোপণের পরের দিন অর্থাৎ ১৫ জুলাই ১৯২৮ সালে শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব শুরু হয়। এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কৃষিজীবীদের প্রতি ভদ্রজনতার যে উন্নাসিকতা তা দূর করা। রামায়নই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ও শেষ কৃষিকাব্য। এই মহাকাব্যে রাজর্ষি জনক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে আদর্শ পুরুষ।

যাই হোক রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত উদ্যোগকে সেই সময় অনেকে কবির খেয়াল বা ভাবোচ্ছাস বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তিত হবার পর প্রায় ২২ বছর অর্থাৎ ১৯৫০ সালে জুলাই মাসে ভারত সরকার বনমহোৎসব আরম্ভকরেন। রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানকে বলেছিলেন 'অপব্যায়ী সন্তান কর্তৃক মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ উৎসব।' সত্যিকথা বলতে কি আজকের পরিবেশ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা তো পথিকৃতের মতো।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরের বছর অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের ২২ শে শ্রাবণ (৭ আগষ্ট ১৯৪৩) সিদ্ধান্ত হয় এই দিনে শান্তিনিকেতনে প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হবে। প্রথম প্রয়াণ দিবসে কবিকন্যা মীরাদেবী সপ্তপর্ণী ছাতিমতলায় রোপন করে বৃক্ষরোপণ-এর সূচনা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর কবির আশ্রমে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে গাছ লাগানো হয়। ১৯৪৩ সালে বাইশে শ্রাবণ আচার্য অবনীন্দ্রনাথ হাসপাতাল এলাকায় গাছ লাগান। এরপর বহুমান্য ও গুণী ব্যক্তিত্ব শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন বছর গাছ লাগিয়েছেন তার তালিকাও দীর্ঘ। এই ভাবে বর্ষার ঋতু উৎসবে ২২ শ্রাবণ বৃক্ষরোপণ শান্তিনিকেতনে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে আছে। তারপরের দিন হলকর্ষণ উৎসব হয়।

আসলে মৃত্যুর ভিতর দুটি বিপরীত ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যু তো জীবনের অন্ত বা পরিসমাপ্তি। কিন্তু আমরা তো পরিসমাপ্তিকে মেনে নিতে পারিনা। আমরা কি ভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করবো। মৃত্যুর পরেও তো জীবনধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাই মহাকবির প্রয়াণ দিবসটিকে আশ্রমে বৃক্ষরোপণের দিনরূপে চিহ্নিতকরণের ভিত্তিটি হচ্ছে নবজীবনের উদ্বোধন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও এখন বাংলাদেশ

ঢাকা থেকে লিখেছেন আবদুল্লা আল ওয়াসিক

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকজন জুনিয়র লেভেল অফিসার ও জওয়ান ৩২ নম্বর ধানমন্ডি রোডে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ঢুকে তাঁকে তাঁর পরিবারের প্রায় সকলকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে । তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ওই সময় দেশে না থাকায় রক্ষা পান ।বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানের আবাসনে অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বাস করতেন না। তিনি কার্যত কোনও কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া নিজের সাবেক সাধারণ বাসভবনে বাস করতেন ।হত্যাকারীরা এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলো ।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে এই নৃশংসভাবে হত্যা করার পিছনে ছিল ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি, পাকিস্তান পন্থী সামরিক অফিসার বাহিনীর গভীর চক্রান্ত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিপূর্ণ মদৎ । এই শক্তি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের জয় ও নিজেদের অপমানজনক পরাজয় ভুলতে পারেনি । বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয় । এরা ক্ষমতা দখলের আড়াই মাস পর ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের ৩ তারিখ ঢাকা জেলে ঢুকে বন্দি চার জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমেদ, নজরুল ইসলাম , কামরুজ্জামান ওবি মনসুর আলিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন। তিনি চক্রান্তকারী রাষ্ট্রপতি খন্দকার মুস্তাক আহমেদ মারফৎ এই মর্মে অর্ডিন্যান্স জারি করান যে বঙ্গবন্ধুর

হত্যাকারীদের কোনও বিচার করা যাবেনা ।জিয়ার আমলে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী ও জামাত ই ইসলামির আমির গোলাম আজম পাকিস্তানি পাসপোর্ট ও বাংলাদেশি ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজে মুক্তিযোদ্ধা হলেও অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করান । তাঁর সময় থেকেই বাংলাদেশে ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে ঘুরতে থাকে । বাংলাদেশ অস্থিতিশীলতা ও মৌলবাদের দিকে যাত্রা শুরু করে।প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা আবদুল্লা আল ওয়াসিক লিখিত এই নিবন্ধটি এখানে প্রকাশ করলাম ; সম্পাদক , নাগরিক।)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে অনেকে অনেক কুৎসা করেন , দিনরাত তাঁর নামে বিষোদগার করেন। কিন্তু, তাঁরা এই সত্যটি জানেন না যে বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়। বাংলাদেশে বাস করে তার ঐতিহাসিক সত্যকে মুছে ফেলার আয়োজন এখন সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। সেদিন দেখলাম বিদ্যুৎ বিলের কপির ওপর যেখানে বঙ্গবন্ধুর ছবি ছাপা ছিল সেখানে নীল কালির সীল মেরে দেয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিদ্বেষ এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধু নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চা করা হচ্ছে। অথচ, আমার ধারণা, এঁরা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারবে না যে, বঙ্গবন্ধুর ত্রুটি আসলে কী? গতবাঁধা কিছু কথা তাঁরা বলবেন । কিন্তু, বঙ্গবন্ধু কি পুকুর চুরি করেছেন নাকি সাগর চুরি, তার কোনও সত্যতা, যৌক্তিক ব্যাখ্যা বা উত্তর তাঁদের কাছে নেই। থাকার কথাও নয়।

আজকের দিনের বড় বড় নেতারা, যাবতীয় ফেসবুক আর, ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সারেরা যারা প্রবলভাবে দেশপ্রেমের বয়ান দিয়ে যান তাদের কারোরই না আছে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, আত্মত্যাগ বা, সাহসিকতা। তাঁদের অধিকাংশই কারাভোগের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। এখন বড় বড় কথা বলেন। অথচ, বঙ্গবন্ধু এই দেশের মানুষের মুক্তি ও সাধারণ মানুষের পক্ষে থেকে তাদের অধিকারের দাবীতে তাঁর জীবনের প্রায় তেরোটি বছর কারাগারেই কাটিয়েছেন। 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ের ফ্ল্যাপ কভারে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা বলেছেন, 'ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা অর্জনের সোপানগুলি যে কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগুতে হয়েছে তার কিছুটা এই 'কারাগারের রোজনামচা' বই থেকে পাওয়া যাবে।

স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সংগ্রামে অনেক ব্যথা-বেদনা, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস রয়েছে। মহান ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহৎ অর্জন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছেন; ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন।

বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিতে চেয়েছেন। বাংলার মানুষ যে স্বাধীন হবে এ আত্মবিশ্বাস বারবার তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। এত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আর কোনো নেতা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন কি না আমি জানি না।'

মজার ব্যাপার হলো বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যারা দুইদিন আগেও একটা চাকরি পাওয়ার প্রত্যাশায় এইসব বই থেকে নানা বক্তব্য বা, উদ্ধৃতি মুখস্থ করতো তারাই এখন প্রবল বিদ্বেষে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলতে চাইছে। সার্জিস আলম সময়ের প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আবেগঘন ভিডিও তৈরি করলেও পরিস্থিতির পরিবর্তনে তার মুখে এখন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোনও রা নেই। এরকম প্রচন্ড সুবিধাবাদী আর, নিজ স্বার্থমগ্ন গোষ্ঠীর উত্থান যখন হয় তখন তাদের থেকে দেশের সামষ্টিক কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে বেশি। এসব তরুণ ও অনভিজ্ঞ নেতারা এখন নানান হঠকারী ও বিচার-বিবেচনাহীন কথাবার্তা বলে চলেছেন। মিডিয়া কাভারেজের দরুন যার অব্যাহত প্রচারে বাংলাদেশকে আরও বিপদসংকুল পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এদের সাথে যুক্ত আছে বাইরের দেশে অবস্থানকারী বিভিন্ন ইউটিউবার, ইনফ্লুয়েন্সার। এঁদের অব্যাহত প্ররোচনায় একটি দেশের শান্তিকামী জনগণ ক্রমান্বয়ে যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি যেখানে ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহনশীল, ক্রমেই তা অসহিষ্ণুতার পথে হাঁটছে, যা দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এইসব ইউটিউবার ও ইনফ্লুয়েন্সারেরা যে যুদ্ধ পরিস্থিতির ক্ষেত্র তৈরি করছে তার দায় কিন্তু তাঁরা নেবেন না। দেশের মানুষ যুদ্ধে জড়ালেও তাঁদের কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু, সাফারার হবো আমরা, মানে এই দেশে বাস করা নিরীহ আম-জনতারা। বিদেশের মাটিতে বসে থাকা ইউটিউবার ও ইনফ্লুয়েন্সারেরা বাংলাদেশকে নিয়ে যে গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত খেলায় মত্ত তা নিয়ে সচেতনতার অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

সদ্য বিতাড়িত আওয়ামীলীগ নজীর বিহীন দুর্নীতি করেছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও দেশের অগ্রযাত্রা ও উন্নয়ন ব্যাহত হয়নি। অর্থনৈতিক নেতিবাচক সূচকের ধারণা বাংলাদেশে কাজ করেনি। এটা হয়তো আন্তর্জাতিক শক্তি ও বোদ্ধা মহলের অনেকের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে। দেশের অগ্রযাত্রায় অর্থনীতির সূচকই যে মূল বিষয় নয় তা যখন স্পষ্ট হতে যাচ্ছে তখনই ক্ষমতার পালা-বদল। আমি লুটপাট-দুর্নীতির সমর্থন করছি না। কিন্তু, লুটপাট-দুর্নীতি বন্ধ করতে যে নৈতিক মনোবল ও উন্নত মাইন্ডসেটের প্রয়োজন তা কি আমাদের আছে? এক পক্ষের দখলদারি ও চাঁদাবাজির জায়গায় এখন আরেক পক্ষ সক্রিয় হয়েছে। আওয়ামীলীগ আমলে বিএনপি-জামায়াত নির্মূলের যে চেষ্টা হয়েছে, এখন সম্মিলিত শক্তি আওয়ামীলীগ নির্মূলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ, মুদ্রা একই আছে। শুধু তার পিঠের পরিবর্তন হয়েছে। অথচ, বাংলাদেশের ভালোর জন্য, ভবিষ্যতে সুস্থ রাজনীতির চর্চা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল 'বিপ্লব' পরবর্তী সময়ে একটা ইনক্লুসিভ শাসন কাঠামো তৈরি করা। যেখানে রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা নয় বরং, দেশপ্রেমিক রাজনীতিক ও দুর্নীতির অভিযোগমুক্ত, সৎ ও উদ্যমী মানুষদের

সমন্বয়ে একটা সমন্বিত সরকার ব্যবস্থা প্রণয়নের। এখন যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে আওয়ামীলীগ মুক্ত করার সঙ্কল্প নিয়েই অন্তবর্তী সরকার কাজ করছে।

ফ্যাসিজম বা, ফ্যাসিবাদ নিয়ে অতীতে বহু লোক সরব থেকেছে। কিন্তু, এখন বর্তমানে যা ঘটছে বা, চলছে সেটাও যে 'ফ্যাসিজম' সেটা চিহ্নিত করার বা, বলার মতো ইনটেলেকচুয়াল'দের আর দেখা যাচ্ছে না। ফ্যাসিবাদকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে এই দু'মুখী নীতি বুদ্ধিবৃত্তিক সুবিধাবাদের দিকেই নির্দেশ করছে।

মাননীয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ভারতের মিডিয়ায় বাংলাদেশকে নিয়ে অব্যাহত অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলেছেন। মিডিয়া অনেক কিছু বলে বা, প্রচার করে। কিন্তু, তাই বলে একটা দেশের পররাষ্ট্র নীতি কি শুধু মিডিয়া নির্ভর হলেই চলে? ভারতের এক শ্রেণির মিডিয়া অপপ্রচার করছে, ঠিক। কিন্তু, যাঁদের নিয়ে অপ-প্রচার করছে সেই হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশের জনগণ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাঁদের সমস্যা কী হচ্ছে বা তাঁদের বক্তব্য শোনার চেয়ে মিডিয়ার অপপ্রচার মূল বিষয় হয় কী করে? একদল সংক্ষুব্ধ মানুষ বিনা কারণে, কোন যুক্তি ছাড়াই অসহিষ্ণু হবে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

সর্বশেষ ইসকন্ নেতাকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সরকার তাদের অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। আমি ইসকন সম্পর্কে বিস্তারিত জানি না। ইসকন নেতা সম্পর্কেও আমার ধারণা নেই। তবে, তাঁর গ্রেফতারের পর চট্রগ্রাম ময়দানে দেয়া ২৩ মিনিটের একটি ভাষণ আমি শুনেছি। সেখানে তাঁর বক্তব্যের মাঝে আমি কোন উস্কানি ও রাষ্ট্র-দ্রোহীতার মতো কথাবার্তা পাইনি। অথচ, তাঁর থেকেও সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহী মূলক কথাবার্তা অনেকেই এখন বলছেন।

কেউ কেউ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার কথাও প্রকাশ্যে বলছেন। ইসকন নেতার বক্তব্য থেকে যেটা বুঝলাম, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে চলা দীর্ঘদিনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর ভাষণে তিনি জগতজ্যোতি দাসের প্রসঙ্গ তুলে হয়তো সেনাবাহিনীর বিরাগভাজন হয়েছেন। তবে, ইসকন নেতা যা বলেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে যেখানে ভবিষ্যৎ সংস্কারের পথে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, সেখানে সরকার দেখিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া। কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা তার ধর্মের মানুষের স্বার্থে বা, সম-অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হতেই পারেন, যেখানে তিনি সরাসরি যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কথা বলছেন, সাম্প্রতিক বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলছেন, সেই পর্যায়ে তিনি আর স্রেফ ধর্মীয় নেতা নন বরং, সেই সম্প্রদায়ের মানুষের রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের একজন আইকনিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন।

অতএব, তাঁকে খোঁড়া যুক্তি দিয়ে গ্রেফতার ও আটক-রিমান্ডের ঘটনা দেশে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতাকে বৃদ্ধি করবে, এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ইসকনের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, সেই নেতার নৈতিক স্খলনজনীত কারণে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। তাঁর নৈতিক স্খলন ঘটে থাকলে সংগঠনের নিয়ম বা দেশের আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কিন্তু, তিনি যা বলছেন সেই বিষয়গুলোকে এর দ্বারা বাতিল বা, ভুল প্রমাণ করা যাবে না। অর্থাৎ, দুটো ভিন্ন বিষয়কে এক করে দেখে সমস্যাকে পাশ কাটানো যাবে না। এই বোধ ও বিবেচনা নিয়েই সরকারের পদক্ষেপ নেয়া জরুরি।

বাংলাদেশে অস্থিতিশীল, অসহিষ্ণু পরিবেশ সৃষ্টি হলে কার লাভ? এতে লাভ আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিগুলোর। আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তি তাদের স্বার্থ দেখে চলে। সে অঞ্চলে বসবাসরত সাধারণ মানুষের মঙ্গলের কথা তারা বিবেচনায় নেয় না। আরবের ইসরায়েল-ফিলিস্তিন, এশিয়ার আফগানিস্তান, এমনকি বর্তমান ইরানও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের ফলাফল।

আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, এই দেশ পার্শ্ববর্তী দেশের 'প্রেসক্রিপশনে' চলে। এখন সেই অবস্থা থেকে বাংলাদেশ যদি কোন বৃহৎ শক্তির সরাসরি 'নিয়ন্ত্রণে' চলে যায় তাহলে সেই দশা কী আমাদের জন্য ভালো কোন ফল বয়ে আনবে? নির্দেশ আর, নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যে ফারাক, সেই ব্যবধানও যদি ঘুঁচে যায় তাহলে কী আমরা জাতি হিসেবে আর দাঁড়াতে পারবো?

যে কোন দেশের উন্নয়ন ও আধুনিকতার পেছনে থাকেন সেই দেশের ইনটেলেকচুয়াল, ভিশনারী ও আধুনিক চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন বুদ্ধিমান রাষ্ট্র নায়কেরা। আধুনিক আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা স্যার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, টমাস জেফারসন বা, আব্রাহাম লিঙ্কন এঁরা সবাই ছিলেন সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা, সংস্কারমুক্ত প্রগতিবাদী। তাঁদের ভবিষ্যৎ মুখী সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়নের দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমেই সেই দেশ এগিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য সে রকম সৎ, প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত ও ভিশনারী রাজনৈতিক নেতৃত্বর এখন ভীষণ প্রয়োজন। নয়তো দেশি-বিদেশি নানা মাত্রার চক্রান্তে আমাদের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব হুমকীর মধ্যে পড়তে পারে। বাংলাদেশের সঙ্কটময় সময়ে আমি সেইসব প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত, ইনটেলেকচুয়াল'দের আহবান জানাই, যাঁরা এই দেশকে সত্যিকার অর্থেই একটা উন্নত ও মজবুত ভিত্তির মধ্যে নিয়ে যেতে পারবে। সেইসব মানুষদের একত্রিত হয়ে এগিয়ে যাওয়া এখন বাংলাদেশের সময়ের দাবী।

ধন্যবাদ সবাইকে।

জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান

সুশান্ত দাসগুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৪)

জরুরী অবস্থা সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধির বক্তব্য

ইন্দিরা গান্ধি ২৬ ও ২৭ জুন (১৯৭৫) তাঁর বেতার ভাষণে কেন তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন। এই দুটি বক্তৃতা ছাড়াও লোকসভা ও রাজ্যসভায় জরুরি অবস্থা অনুমোদনের জন্য তিনি ২২ জুলাই এই ঘোষণা জারির স্বপক্ষে বক্তৃতা দেন। এছাড়াও তিনি ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে দেশের ও বিদেশের অসংখ্য সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমকেও সাক্ষাৎকার দেন। সব সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেন, ২৫ জুন ও তার আগে যাই সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়ে থাকুক ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। প্রতিটি সাক্ষাৎকারেই তিনি একথাটি জোর দিয়ে বলেন যে ২৫ জুনের জনসভায় যে হুমকি দেওয়া হয় তার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই দেশের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা, ঐক্যকে বিনষ্ট করা। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও হুমকির জোরে দেশের সামাজিক ঐক্য ও জাতি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছিল।

সরকারের পক্ষ থেকে ২১ জুলাই, ১৯৭৫ সংসদের উভয় কক্ষে 'কেন জরুরি অবস্থা' শীর্ষক শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয় দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বিনষ্ট করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল তা ব্যর্থ করার জন্যই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছিল। এর সঙ্গে বলা হয়ে যে কিছু হতাশ রাজনৈতিক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি ফ্যাসিস্ত সংগঠন, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাজে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করছিল। দেশের আত্মপ্রত্যয়কে এইভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়।। গণতন্ত্রের নামে যে আন্দোলন করা হচ্ছিল তার উদ্দেশ্যই ছিল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বিধানসভাগুলি ও সংসদকে কাজ করতে না দেওয়া, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করা ও সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া নেওয়া ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না। কোনও বৈধ সরকারের পক্ষে দেশের নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব, অর্থনীতির বিপর্যয়কে নীরব দর্শকরূপে সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে সংসদে প্রদত্ত বিবৃতির উপরোক্ত সংক্ষিপ্তসার রাখা হল। ওই বছরই ১ আগস্ট নিউইয়র্কের 'স্যাটারডে রিভিউ' পত্রিকার সাংবাদিক নর্মান কাসিনসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা গান্ধি বিরোধী দলের সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে 'গৃহবন্দি' করার হুমকি ও সামরিক-আধা সামরিক বাহিনীকে বিদ্রোহ করার যে আহ্বান জানানো হয়েছিল সে সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তাঁর সরকারকে এইভাবে উচ্ছেদ করে তারা কোনপন্থা অবলম্বন করত ? অবশ্যই তা ছিল সংবিধান বহির্ভূত পন্থা। এই পন্থা সফল হলে দেশের সাংবিধানিক গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যেত। তিনি বলেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করা হয়েছে। দেশের সংবিধানের ধারা ধ্বংস করা হয়নি। তার পরিবর্তে দেশের সংবিধানকে রক্ষা করা হয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধি বারবার করেই সংখ্যালঘু বিরোধী পক্ষের সম্পর্কে এই অভিযোগ এনেছিলেন যে তারা হিংসা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। তাঁর অভিযোগ ছিল, বিরোধীরা কোনওভাবেই 'সাংবিধানিক ও আইনগত' কোনও বিবেচনার পথেই চলতে প্রস্তুত নয়। তারা এলাহাবাদ হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'সংবিধান বহির্ভূত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ও গণতন্ত্রকে পঙ্গু করে' বলপূর্বক কার্যকর করতে চেয়েছিল। তিনি হিংসা ও গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি যে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল সেকথা উল্লেখ করতেন। এর স্বপক্ষে তিনি গুজরাত ও বিহারের তথাকথিত আন্দোলনের অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তবে এটি খুবই কৌতূহল ও আগ্রহের বিষয় যে ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগে ও পরে কখনই জয়প্রকাশ নারায়ণকে অগণতান্ত্রিক বা হিংসার প্রচারক বলে অভিযোগ বা এমনকী উল্লেখ পর্যন্ত করেননি।

তিনি প্রায়ই বলতেন যে জেপি বা তাঁর আন্দোলনে যুক্ত সংগঠন কংগ্রেস ও ভারতীয় লোকদলের নেতারা অহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে চান। তাঁরা হিংসা চান না, চান না গণতন্ত্রের পতন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁরা তাদের প্রতি জনসমর্থনের ঘাটতি ও সংগঠনহীনতার জন্য এমন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করছেন যারা অহিংসার বিরোধী ও একনাকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই শেষের কথাটি ছিল নকশালপন্থী, আনন্দমার্গী ও বিশেষ করে আর এস এস সম্পর্কে প্রযোজ্য।

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধি

আর এস এস সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে এরা সাম্প্রদায়িক, সংখ্যালঘুদের বিরোধী, এদের গোপন সাংবিধান আছে ও হিংসায় বিশ্বাসী। এর আগে ২২ জুলাই অন্য একটি প্রসঙ্গে বলার সময়ে তিনি সংসদে বলেন যে 'আমি, আর এস এস কিশোর-যুবকদের যেভাবে তাদের শাখায় নিয়ে গিয়ে ট্রেনিং দেয় ও হিংসাত্মক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেয় তার তীব্র নিন্দা করি' একথা বলে ইন্দিরা গান্ধি বলেন কিন্তু আর এস এস-এর আসল অস্ত্র হচ্ছে সংগঠিতভাবে

গুজব ছড়িয়ে প্রচার চালানো। বিরোধী দলের একজন সদস্য ইন্দিরা গান্ধির কাছে 'ফ্যাসিজম' কী তা জানতে চাইলে শ্রীমতী গান্ধি সংসদে বলেন যে ফ্যাসিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে দলীয় মিথ্যা প্রচার চালানো। ক্রমাগত গুজব ছড়িয়ে প্রচার চালানো এবং সব সময় কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে 'বলির পাঁঠা' বানানো বা 'শত্রু' বলে প্রচার চালানো। জনসংঘ ও আর এস এস-এর এটিই হচ্ছে প্রধান অস্ত্র।

সেপ্টেম্বরে একজন জার্মান সাংবাদিক কে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় ইন্দিরা গান্ধি বলেন জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগে ও পরে কখনই তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণকে অগণতান্ত্রিক বা হিংসার প্রচারক বলে অভিযোগ বা এমনকী উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। তিনি প্রায়ই বলতেন যে জেপি বা তাঁর আন্দোলনে যুক্ত সংগঠন কংগ্রেস ও ভারতীয় লোকদলের নেতারা অহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে চান। তাঁরা হিংসা চান না, চান না গণতন্ত্রের পতন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁরা তাদের প্রতি জনসমর্থনের ঘাটতি ও সংগঠনহীনতার জন্য এমন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করছেন যারা অহিংসার বিরোধী ও একনাকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই শেষের কথাটি ছিল আনন্দমার্গী , জামাত ই ইসলাম ও বিশেষ করে আর এস এস সম্পর্কে প্রযোজ্য।

শ্রীমতী গান্ধি বলেন যে তিনি কখনই সমস্ত বিরোধীদের ফ্যাসিস্ত বলেননি। তিনি মনে করিয়ে দেন যে তিনি একটি গোষ্ঠীকেই 'ফ্যাসিস্ত' বলে মনে করেন এবং সেটি হচ্ছে আর এস এস। ফ্যাসিবাদীদের প্রচার কৌশলের যে ব্যাকরণ আছে আর এস এস তাই অনুসরণ করে। তারা একটি সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে (পড়ুন হিন্দু)। তাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনী আছে। এবং তারা সংগঠিতভাবে প্রতিদিন মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের একটি অংশ ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে শুরু করছে যে এতবার করে একটি কথা যখন আর এস এস বলছে তখন নিশ্চয়ই এই কথার মধ্যে সত্যতা আছে।

শ্রীমতী গান্ধি এই প্রসঙ্গে একথাও বলেন যে সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীসমূহ যেহেতু সাম্প্রদায়িক তাই তাঁরা অগণতান্ত্রিক। ভারতের পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতে 'গণতন্ত্র'কে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে। যদি কখনও কোনও রাজনৈতিক মোর্চা আর এস এস-এর ওপর নির্ভর করে ক্ষমতায় আসে তাহলে শুধু ভারতীয় গণতন্ত্রই নয়, ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতাও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

ইন্দিরা গান্ধির এই বিশ্লেষণ যে কত সঠিক ছিল আজ বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তা বোঝা যাচ্ছে। (ক্রমশ)

বিচারপতিদের প্রমাণ করতে হবে তাঁদের দায়িত্ব জনতাকে ন্যায় দেওয়া, দলদাস হওয়া নয়

অমিতাভ সিংহ

বাংলা বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী,বিপ্লবী, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, বিচারপতি,রাজনীতিবিদদের জন্ম দিয়েছে।কিন্তু এমন বিচারপতি বাংলা বা দেশ সম্ভবত আগে দেখেনি ।

যে পরিবারের একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশের জন্য লড়াই করেছেন, দেশকে গড়তে গিয়ে শহীদ হয়েছেন , বিচ্ছিনতাবাদীদের বা সন্ত্রাসবাদীদের হাতে প্রান বিসর্জন দিয়েছেন , সেই পরিবারের সদস্য ও দেশের সংসদের বিরোধী দলের নেতার ভারতীয়ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা ? কে এই নিম্নস্তরের প্রশ্নটি তুললেন ? একজন বাঙালী বিচারপতি। বিচারপতিদের কাজ দেশের মানুষকে ন্যায় পাইয়ে দেওয়া। তা না করে সেই বিচারপতি অর্থাৎ দীপঙ্কর দত্ত রাহুল গান্ধিকে উপদেশ বা জ্ঞান দিলেন তাঁর কি করা উচিৎ। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর কথা শুনে মনে হচ্ছে দেশের বিরোধী নেতা কি বলবেন ,কখন বলবেন ,কিভাবে বলবেন ,কতটা বলবেন ,কোথায় বলবেন তা ঠিক করে দেওয়া যেন উক্ত বিচারপতির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

প্রসঙ্গটা কি ?

গতবছর রাহুল গান্ধি কণ্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত চার হাজার কিলোমিটারের বেশী পথ পায়ে হেঁটে ' ভারত জোড়ো ' যাত্রা করেন । এই যাত্রায় তিনি বলেন অরুণাচল প্রদেশে চিনা সেনারা ভারতীয় সেনাদের মারধোর করছে। ভারতের প্রায় দুহাজার বর্গ কিলোমিটারের বেশি ভুখন্ড দখল করে নিয়েছে চিন। রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেছিলেন মোদী সরকার চিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এই মন্তব্যের পর রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয়। সেই মামলার শুনানিতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত রাহুল গান্ধির তীব্র সমালোচনা করেন। যে ভাষায় তাঁর সমালোচনা করেন তা আদৌ রুচিসম্মত কিনা সে প্রশ্ন উঠেছে।একাধিক প্রাক্তন বিচারপতির মতে এই ধরণের মন্তব্য সমীচীন নয় ।

কি বলেছেন উক্ত বিচারপতি ?

ভারতের দুহাজার বর্গ কিমি জমি চিনারা দখল করে নিয়েছে এটা আপনি জানলেন কি করে ? আপনি কি সেখানে ছিলেন ? এব্যাপারে আপনার কাছে কি প্রামাণ্য নথি আছে ? আপনি যদি প্রকৃত ভারতীয় হন তাহলে এমন কথা বলতেন না। তিনি আরও বলেছেন এসব কথা সমাজমাধ্যমে না বলে সংসদে বলা উচিত ছিল।

আশ্চর্য এটাই যে বিচারপতি কি কোনও খবর রাখেন না ? সংসদে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধি একই কথা বিস্তৃতভাবে বলেছেন।বিচারপতি কি জানেন না একই কথা লাদাখ থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ ও

বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী বলেছেন ।রাহুল গান্ধির পিতা ও ঠাকুমা বিচ্ছিনতাবাদীদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন,অথচ তাঁকে বলা হচ্ছে দেশদ্রোহী ? রাহুল গান্ধির দেশভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, অবিকল বিজেপি নেতাদের সুরে। যেকথা অনুরাগ ঠাকুর বা নিশিকান্ত দুবে বলে সেই কথা একজন বিচারপতির মুখে? তাহলে তিনি কি দিনে দিনে বিজেপির একজন নেতা হয়ে গেলেন , যেমন অভিজিত গাঙ্গুলি হয়েছেন? এর আগে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা সংক্রান্ত মামলায় উক্ত বিচারপতি এধরণের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন এবং রাহুল গান্ধিকে কটুক্তি করেছিলেন মোদী শাহের ভাষায় ।আর বিরোধী দলের নেতা কি কেবল সংসদে কথা বলবেন । অন্যত্র তাঁর বাক স্বাধীনতা নেই ? তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারেন , জনসভায় ভাষণ দিতে পারেন, পত্র পত্রিকায় লিখতে পারেন । এই অধিকার তাঁর আছে ।

আসল ঘটনাটা কি?

২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং সেক্টরে ভারত ও চিনের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তার আগে ১৫ জুন ২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় চিনের সঙ্গে সংঘর্ষে ২০ জন জওয়ান মারা যায়। তাদের অন্তিম সৎকার হওয়ার ছবি দেশের মানুষ দেখে। ঠিক সেসময় দেখা গেল ভারতের বিদেশ সচিব চিনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একসাথে কেক কাটছেন ।যেন ভারতের বিশজন জওয়ানের শহীদ হওয়ার উদযাপন।

আর তার চারদিনের মাথায় দেশের প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দেন যে কেউ ভারতের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে নি। একবার বললেন না রাহুল গান্ধির অভিযোগ মিথ্যা। বললেন না যে চিন ভারতের মধ্য ঢুকে একখণ্ড জমিও দখল করে নি।আসলে চিনের নামটা নেওয়ার মত সাহস বা মেরুদণ্ডটা তার কোনদিনই ছিল না। যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প তিরিশ বার বলেছেন যে তিনি ভারত পাকিস্তানের মধ্যে চলা যুদ্ধ থামিয়েছেন তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার সাহস মোদী দেখাতে পারেন নি।

এখন প্রশ্ন তাহলে ২০ জন জওয়ান মারা গেলেন কিভাবে ? আর অরুনাচল প্রদেশের বিজেপির সাংসদ তাপির গাও তো একই কথা উল্লেখ করে সংসদে বলেছেন অরনাচলকে আরেকটা ডোকালাম হতে বাঁচাও। লাদাখের সাংসদ তো একই ভাষ্য দিয়েছেন ।বিজেপির বড় নেতা স্বামী বলেন নি যে চিন ভারতের জমি দখল করে নিয়েছে আর মোদী রাজনাথ চুপ করে বসে আছেন। এএনআই চ্যানেলের স্মিতা প্রকাশের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোদ রাজনাথ সিং তো বলেছেন দুদেশের সেনাদের মধ্যে কম্যান্ডার পর্যায়ে নিয়মিত বৈঠক হচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন উঠবে না কি বিষয়ে এই বৈঠক? এই বৈঠক যে আসলে দখল করা জমি ফেরানো সম্পর্কে তা বলে না দিলেও বোঝা যায়। সেনাকর্তারাও তো একই কথা বলেছেন ।যদিও তাদের সাংবাদিক সম্মেলন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। তাই প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারভানের বই প্রকাশ করতে দেয় নি বিজেপি সরকার। স্যাটেলাইটের ছবিতেও একই তথ্য। চিন ভারতের জমিতে ঢুকে বসে রয়েছে ।লাদাখের ১০০০ বর্গ কিলোমিটার জমি দখলের খবর মিথ্যা? সেখানের ৬৫ টি পয়েন্টের মধ্যে ২৬ টিতে ভারতীয় সেনা ঢুকতে পারছে না। চায়না বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মা চালানিও একই প্রশ্ন করেছেন ।সংসদে অখিলেশ যাদব প্রশ্ন করেছিলেন ২০১৪ সালের আগে ভারতের আয়তন বা ক্ষেত্রফল কত ছিল আর আজ কত তা জানাক কেন্দ্রীয় সরকার ।আজ পর্যন্ত তার উত্তর বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারে নি ।বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলছেন চিন এত বড় অর্থনৈতিক শক্তি যে তার সঙ্গে কিভাবে মোকাবিলা করব? তবুও মোদী শাহরা স্বীকার করবেন না যে চিন আমাদের ভুখন্ড দখল করে রেখেছে । এতই ভয় চিনকে ও একইসঙ্গে বিরোধী দলগুলিকে ও ভারতীয় জনতাকে। অথচ এই মোদী ২০১৪ সালের পূর্ব যখন তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন বলেছিলেন মনমোহন সিং সরকার দূর্বল। আমাদের সেনা দূর্বল হয়ে গেছে। তখন তো তাকে দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দেওয়া হয় নি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে যখন পাকিস্তানকে আক্রমণ থেকে সরে আসতে হল তখন তার বিরুদ্ধে কোন বিবৃতি না দিয়ে নীরবে তা মেনে নিলেন মোদীজি তখন তাকে কি বলবেন এই বিচারপতি ? দেশের সংসদের বিরোধী নেতা দেশের সীমানা বা লাইন অব কন্ট্রোল নিয়ে কথা বললে তা হয়ে যায় দেশদ্রোহিতা? অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমক্রাটিক রিফর্মসের মত বহু সংগঠন এর নিন্দা করেছে। আসলে গোদী মিডিয়া মোদীর কাছে সুপারী নিয়ে হাত ধুয়ে রাহুল গান্ধির পেছনে লেগে পড়েছে। কতভাবে তাকে অপদস্থ করা যায় তার প্রতিযোগিতা। এর আগে একটা মানহানির মামলায় তার সাংসদপদ তড়িঘড়ি কেড়ে নিয়ে তাকে বাংলো খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ।যদিও পরবর্তীকালে উচ্চ আদালতের রায়ে রাহুল আবার সাংসদপদ ফেরত পান। রাহুলকে কোনও প্রশ্ন করার অধিকার দিতে চায় না বিজেপি সরকার ।একই কথা সাধারণ মানুষের জন্যও প্রযোজ্য। দেশে সরকারের কোন কাজে প্রশ্ন করার কারো কোন অধিকার থাকবে না,এটাই বিজেপির দর্শন। একজন ধর্ষণকারী ধর্মগুরু রাম রহিম জেলবন্দী। নির্বাচনের ঠিক আগে বারবার তাকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির পক্ষে ভোটভিক্ষা করায় সরকার ।প্রশ্ন করা যাবে না? দিল্লীর প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের মামলায় দিল্লী কোর্ট ক্লোজার রিপোর্ট দিয়ে দেওয়ার পরেও কেন জেল থেকে ছাড়তে দেরী করছে কেন এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা চলবে না? অথচ মনমোহন সিং এর আমলে মুম্বাই হামলার পর সেখানে পৌঁছে মোদী সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তখন তো মিডিয়া বা কংগ্রেস কোন প্রশ্ন তোলে নি। কারণ তখন দেশে গণতন্ত্র ছিল বলে?

বিচারপতির এমন ভাষ্য কেন?

আসলে বর্তমান বিচারপতিরা মনে করছেন বিজেপিকে তুষ্ট করলে অবসর নেওয়ার পর বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ পাওয়া যাবে।

তাদের সামনে উদাহরণ হিসাবে রয়েছে প্রাক্তন বিচারপতি রন্জন গগৈ যিনি রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন। রয়েছেন আবদুর নাজির যিনি অবসর গ্রহণের দুমাসের মধ্যে একটি রাজ্যের রাজ্যপাল হয়েছেন। অশোকভূষন,অরুন মিশ্রর মত প্রাক্তন বিচারপতিরাও বিভিন্ন পদ পেয়েছেন তাতে বড় অংকের অর্থ মাহিনা হিসাবে তো আছেই এবং তার সঙ্গে নানারকম সুযোগ সুবিধা। ফলে বিচারপতিরা লোভ সামলাতে পারেন না । প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের বাড়ির গনেশ পূজায় মোদী স্বয়ং হাজির।এর ফলে কি করে বিচারপতিরা শাসকদলের বিরুদ্ধে রায় দেবেন ? মাননীয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত কী করে মহারাষ্ট্রের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফর্ণবিশ উপ মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধের সঙ্গে Photo Sessionকরেন ?

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শিবু সোরেন

(১১ জানুয়ারী ১৯৪৪ , ৪ আগস্ট ২০২৫)

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিবু সোরেন ছিলেন দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ এবং পুর্ব ভারতের আদিবাসীদের কাছে একজন সম্মানিত জননেতা । আদিবাসী প্রধান ‘ ঝাড়খণ্ড ‘ রাজ্য গঠন করার ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল অবদান ছিল৷ আদিবাসী জনসাধারণ তাঁকে ‘ দিশম গুরু ‘ বলে সম্বোধন করতো। তিনি ছিলেন আদিবাসীদের জনপ্রিয় ‘ গুরুজি ।’

শিবু সোরেন ঝাড়খণ্ড থেকে রাজ্যসভার সদস্য এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) দলের নেতা ছিলেন। তিনি তিনবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথমবার ২০০৫ সালে মাত্র ১০ দিনের জন্য (২ রা মার্চ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত), এরপর ২০০৮ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত, এবং আবার ২০০৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ইন্ডিয়া জোটের শরিক দল জেএমএম-এর সভাপতিও ছিলেন। সোরেন দুমকা থেকে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ এবং ২০০২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত লোকসভার সাংসদ ছিলেন। তিনি তিনবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কয়লা মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬। তবে, ১৯৯৪ সালে তার ব্যক্তিগত সচিব শশীনাথ ঝা-কে হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দিল্লির একটি জেলা আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল।অতীতেও তাঁর বিরুদ্ধে অন্যান্য ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছিল।

শ্রীসোরেনের জন্ম রামগড় জেলার নেমরা গ্রামে। সেই সময় এই এলাকাটি বিহার রাজ্যের অংশ ছিল। তিনি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। তিনি ঐ জেলাতেই তাঁর স্কুলের পড়াশোনা শেষ করেন। তিনি যখন স্কুলে পড়তেন, সেই সময় মহাজনদের ভাড়া করা গুণ্ডাদের হাতে তাঁর বাবা খুন হন।

১৮ বছর বয়সে তিনি ‘সাঁওতাল নবযুবক সংঘ’ গঠন করেন ।৩৪৪ ১৯৭২ সালে, বাঙালি মার্ক্সবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এ. কে. রায়, কুড়মি-মাহাতো নেতা বিনোদ বিহারী মাহাত এবং সাঁওতাল নেতা শিবু সোরেন মিলে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) গঠন করেন। সোরেন জেএমএম-এর সাধারণ সম্পাদক হন। দখল হয়ে যাওয়া আদিবাসী জমি ফেরত পাওয়ার জন্য জেএমএম আন্দোলন শুরু করে। তারা জোর করে সেই সব জমিতে ফসল কাটা শুরু করে। শিবু সোরেন জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক বিচার করার জন্য পরিচিত ছিলেন। এর জন্য তিনি কখনও কখনও নিজের আদালতও বসাতেন। ১৯৭৫ সালের ২৩শে জানুয়ারী, তাঁর বিরুদ্ধে ‘বহিরাগত’ বা অ-আদিবাসী মানুষদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি অভিযানে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় অন্তত ১১ জন নিহত হন। এই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অপরাধে সোরেন এবং আরও অনেকে অভিযুক্ত হন। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর, ২০০৮ সালের ৬ই মার্চ সোরেন বেকসুর খালাস পান। তবে, ১৯৭৪ সালের দুটি মৃত্যুর ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ এখনও বিচারাধীন রয়েছে।

তিনি ১৯৭৭ সালে তাঁর প্রথম লোকসভা নির্বাচনে হেরে যান। ১৯৮০ সালে তিনি প্রথমবার দুমকা থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। এরপর তিনি ১৯৮৯, ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালেও লোকসভায় নির্বাচিত হন। ২০০২ সালে তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি দুমকা লোকসভা আসনের উপ-নির্বাচনে জয়ী হন এবং রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ২০০৪ সালে পুনরায় নির্বাচিত হন। ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিনি মোট আট বার দুমকা কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রজত কান্ত রায়

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক , বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য রজত কান্ত রায় গত ৬ আগস্ট কলকাতায় প্রয়াত হয়েছেন৷ মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৯ ।

রজতকান্ত রায়ের জন্ম ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ ই মে কলকাতায়। পিতা ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব কুমুদকান্ত রায়, আইসিএস ছিলেন। পিতামহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক কামাক্ষ্যা রায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

রজতকান্ত রায়ের স্কুলের পড়াশোনা কলকাতার বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে। ইতিহাসে সাম্মানিকসহ স্নাতক হন কলকাতার

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। সেখানে তিনি অশীন দাশগুপ্তর ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরের পর অনিল শীলের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে আসেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল - ১৮৫৭ - ১৯৭৭ খ্রিস্টাধ সময়ে বাংলায় ''সামাজিক দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক অস্থিরতা''র। পরে এটি পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'একা একা নিমালু'' নরসিংহদাস স্মৃতি পুরষ্কারে সম্মানিত হয়।

পিএইচডি করার পর তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে এক বছর অধ্যাপনা করেন। এরপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগে রিড়ার (১৯৭৫ - ১৯৮২) এবং পরে অধ্যাপক (১৯৮২ - ২০০৬) হন। কলেজের ইতিহাসে একমাত্র তিনিই ছিলেন দীর্ঘ সময়ের অধ্যাপক। এরপর ২০০৬ খ্রিস্টাধ হতে ২০১১ খ্রিস্টাধ পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

এই বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল - পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ (১৯৯৪) আরবান রুটস্ অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম প্রেসার গ্রুপস্ অ্যান্ড কনফ্লিক্ট অফ ইনটারেস্টস্ ইন ক্যালকাটা সিটি পলিটিকস (১৯৭৯) ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইন ইন্ডিয়াগ্রোথ অ্যান্ড কনফ্লিক্ট ইন দ্য প্রাইভেট করপোরেট সেক্টর (১৯৭৯), একা একা নিমালু (১৯৯৩) ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অনট্রপ্রেনিয়রশিপ ইন ইন্ডিয়া - (১৮০০-১৯৪৭) (১৯৯৪)।

এছাড়াও তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ, যথা -- রবীন্দ্রনাথজীবনদেবতা জীবনী(২০১২) আজ রজতকান্ত রায়ের মতো মানুষের প্রয়াণে ইতিহাসের ক্লাসরুম থেকে শুরু করে গবেষণাগার, সবেতেই তৈরি হল এক অদ্ভুত শূন্যতা। তবে তাঁর লেখা, তাঁর ভাবনা আর শেখানো ইতিহাস বেঁচে থাকবে, পথ দেখাবে আগামী প্রজন্মকে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগে অসংখ্য প্রথিতযশা ঐতিহাসিক অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যাপক রুদ্রাঅংশু মুখার্জি লিখেছেন রজত কান্ত রায় ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভিন্ন যুগের দিকপাল অধ্যাপক ঐতিহাসিকগণ যথা কুরুভেলা জাকারিআ , সুশোভন সরকার , অমলেশ ত্রিপাঠি , অশীন দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তির প্রকৃত উত্তরসূরী। আজ রজতকান্ত রায়ের মতো মানুষের প্রয়াণে ইতিহাসের ক্লাসরুম থেকে শুরু করে গবেষণাগার, সবেতেই তৈরি হল এক অদ্ভুত শূন্যতা। তবে তাঁর লেখা, আর শেখানো ইতিহাস ভাবনা বেঁচে থাকবে, পথ দেখাবে আগামী প্রজন্মকে।

অভয়ার হত্যাকাণ্ডের পর এক বছর : বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

ডাঃ বিষাণ বসু

তার পর অনেক অনেক দিন কেটে গেছে। গঙ্গা-তিস্তা-রূপনারায়ণ দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ লাগব-লাগব পরিস্থিতি হতে হতেও হয়নি। সেই না হওয়া যুদ্ধে নৈতিক জয় কার, সে নিয়ে তর্কও হতে হতে পুরনো হয়ে গেছে। গাজায় গণহত্যা ঠিক কবে শুরু হয়েছিল, তা কারোরই ঠিক করে মনে নেই। তবে মরার মতো কিছু শিশু কিংবা মহিলা যেহেতু এখনও বেঁচে রয়েছে, তাই গণহত্যা চলছে। এদিকে দেশের শাসকদলের হাতে যে কয়েকটি রাজ্য চালানোর ভার রয়েছে, তার সবক'টিতেই বাঙালি তাড়ানোর অভিযান চালু হয়েছে। বাঙালি মানেই সম্ভাব্য অনুপ্রবেশকারী। বাংলায় কথা বলা মানেই সম্ভাব্য বাংলাদেশী। অতএব, সাবধানের মার নেই। বাঙালি দেখলেই প্রশ্ন করো। জানতে চাও, কাগজ রয়েছে তো? যে কাগজই দেখান, নিশ্চিত থাকুন, তাঁরা দেখতে চাইবেন তার বাইরে অন্য কোনও কাগজ। এদিকে স্কুল-শিক্ষকদের চাকরি গেছে , চাকরি ফেরত চাইবার লড়াই করতে করতে মনোবলও গেছে , শুরু থেকে পাশে কতজন ছিলেন জানি না, তবে সংখ্যাটা এখন হাতেগোনা। এসবের মধ্যে হইহই করে পালিত হয়েছে দুর্গোৎসব দীপাবলি বড়দিন ইংরেজি নিউ ইয়ার থেকে বাংলা নববর্ষ রথযাত্রা , মাননীয়ার আবদার মেনে বঙ্গবাসী উৎসবে ফিরেছে তো বটেই, একেবারে প্রমোদে ঢেলে দিয়েছে মন , ফুলেফেঁপে ওঠা উৎসবের লিস্টি মেনে পালিত হয়েছে অক্ষয়তৃতীয়া রামনবমী ইত্যাদিও , উড়িষ্যা উজিয়ে এসে বঙ্গের মুখ্য আরাধ্যর আসন লাভ করেছেন জগন্নাথদেব , এককথায় কত কিছুই না ঘটে গেছে মাঝের এই বারো মাসে।

শুধু ফুটফুটে যে তরুণী চিকিৎসক অভয়া হয়ে গেল, সেই মেয়েটা আজও বিচার পেলো না!

বিচার পায়নি? বললেই হবে? ঘটনার পর মাত্র সাত-দশদিনের মধ্যে কলকাতা পুলিশ খপ করে অপরাধী ধরে ফেলল , আর তারপর দেশের সেরা গোয়েন্দাদের দল, খাস সিবিআই, সাতমাস ধরে সাতমণ তেল পুড়িয়ে জানালো যে হ্যাঁ, অপরাধী ওই সে-ই, টুকটাক তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়েছে বটে (কেননা তথ্যপ্রমাণ লোপাটের দায়ে দুচারজনকে জেলটেল খাটতে হয়েছে, সে হোক গে) কিন্তু তদন্তে কিছু গাফিলতি হয়নি। এরপরেও বলবেন, বিচার হয়নি?

যথাযথ বিচার পাননি, এই মর্মে হতাশা প্রকাশ করায় স্বয়ং সিবিআই মরা মেয়ের মা-কে অধি বকে দিয়েছে , আপনারা কি চান যে আমরা আপনাদের ইচ্ছে মেনে তদন্ত করি? ঠিকই তো। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা তদন্ত করবে কেন্দ্রের ইচ্ছে মেনে , আর কেন্দ্রের

সরকারের সঙ্গে রাজ্যের সরকার তলায় তলায় হিসেবনিকেশ করে চললে, রাজ্যের ইচ্ছেই কেন্দ্রের ইচ্ছে , সুতরাং, খুবই স্বাভাবিক, সুশাসনের এই সুবর্ণযুগে, খুন-ধর্ষণের তদন্ত কখনোই ধর্ষিতা-নির্যাতিতার হতভাগ্য বাপমায়ের ইচ্ছে মেনে হতে পারে না।

আপনি কি বিস্মিত হচ্ছেন? হতাশ হচ্ছেন? কিংবা ক্রুদ্ধ? আহা, বড় দেরি করে ভাবতে বসেছেন মশাই! যে মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকালের শুভসূচনা হয় গারদের ওপার থেকে অপরাধী ছাড়িয়ে আনা দিয়ে, তাঁর কাছ থেকে আইনের শাসন আশা করেছিলেন? অত্যন্ত সুপরিকল্পিত দুর্নীতির মাধ্যমে যিনি শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য অবধি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে সর্বনাশের অতলে ঠেলে দিলেন , সে সর্বনাশ এমনই গভীর, যে, আর্থসামাজিক শ্রেণীর অঙ্কে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো শিক্ষা ব্যাপারটাকেই অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য ভেবে বসলেন (অথচ শিক্ষার সেই অধিকার তাঁরা অর্জন করেছিলেন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরেই) আর উঁচুকোঠার কিছু জ্ঞানীগুণী বিশ্বাস করাতে চাইলেন যে সাবঅলটার্নের উত্থান এভাবেই হয় , আপনি ভেবেছিলেন তিনি সাধারণ এক রাজনীতিক মাত্র? গেরামভারি অধ্যাপক থেকে জ্বালাময়ী কবিতা-লেখা কবি থেকে প্রতিভাবান শিল্পী , আর গাইয়ে-বাজিয়ে-অভিনেতা-ফিল্মডিরেক্টর তো আছেই , যিনি প্রমাণ করে ছাড়লেন যে ওসব প্রতিভা-কোয়ালিটি ইত্যাদি বিলকুল বাজে কথা, স্রেফ জায়গা বুঝে ভাত ছেটালেই খ্যামটা নাচার কাকের অভাব হয় না , আপনি বিশ্বাস করলেন যে তিনি 'লেসার এভিল'? দোষটা তাহলে কার? আপনার চেতনাগত অপদার্থতার, নাকি সেই অপদার্থতাসঞ্জাত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ক্ষমতায় রয়েছেন তাঁর?

এমতাবস্থায়, এই পরিস্থিতিতে, যাঁদের সক্রিয় উদ্যোগে অপরাধ সঙ্ঘটিত হয়, যাঁদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে অপরাধের প্রমাণ লোপাট হয় , আপনি সত্যিই আশা করেন যে তাঁদেরই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখে অপরাধের সুবিচার পাবেন? বা পাওয়া সম্ভব?

একধরনের সুবিচার অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু সেরকম সুবিচার তো আপনারা পেয়েই গিয়েছেন, অথচ কিছুতেই যেন সন্তুষ্ট হতে পারছেন না! অর্থাৎ কলকাতা পুলিশের দক্ষ তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত হত্যাকারী-ধর্ষণকারী , সিবিআইয়ের শিলমোহরপ্রাপ্ত সেই দক্ষ তদন্ত , ঘটনার সপ্তাহখানেকের মাথায় অপরাধী হাতেগরম গ্রেফতার , তলিয়ে ভাবার ক্ষমতা যখন হারিয়েছেন, জীবনে মস্তিষ্কের ব্যবহার যখন বিস্মৃত হয়েছেন, তখন সেই 'সুবিচার' নিয়ে খুশি থাকুন, প্লিজ।

কথাগুলো তিক্ত শোনাচ্ছে? শোনাক গে। এছাড়া আর কী-ই বা বলার আছে? এত বড় খুন-ধর্ষণের ঘটনা ঘটে গেল কলকাতা শহরের ব্যস্ততম একটি হাসপাতালে , অবশ্য ঘটনাটা ঘটল এতই গোপনে যে স্বয়ং অপরাধী আর খুন হয়ে যাওয়া ডাক্তার মেয়েটি বাদে কেউই কিছু জানতে পারেনি , খুন-ধর্ষণের প্রসঙ্গক্রমে স্বাস্থ্যব্যবস্থার কিছু দুর্নীতি প্রকাশ্যে এলো বটে, কিন্তু সেসব ঘটনা সামনে আসাটা স্রেফ বাইপ্রোডাক্ট , এরপর খুব বেশি কিছু বলার থাকে কি? বলব? তাহলে আজ আপাতত বাকি সব প্রসঙ্গ ছেড়ে স্বাস্থ্যের কথা-ই বলি।

সত্যি বলছি, ঘটনার পর আপনাদের এত বিস্মিত হওয়া মানায় না। কেননা, অভয়ার মৃত্যু কোনও আচমকা দুর্ঘটনা নয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে হাসপাতালগুলো, মেডিকেল কলেজগুলো, দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। উঠতে পেরেছে প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের মদতে , এবং আপনাদের সক্রিয় নিষ্ক্রিয়তায়। আপনারা, অর্থাৎ যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠককুল এই লেখা পড়ছেন, আপনারা সরকারি হাসপাতালে যাওয়া বন্ধ করেছেন আগেই। আপনারা জানেন যে আপনাদের জন্য রয়েছে শাইনিং হেলথকেয়ার , পাঁচতারা কর্পোরেট হাসপাতাল। অবশ্য সত্যিসত্যিই সেসব হাসপাতালে যেতে হলে বিল দেখে আপনাদের পিলে চমকে যায়। এবং মুখ্যমন্ত্রী সেসব হাসপাতালের অর্থগৃধ্নু মানসিকতা নিয়ে ধমকাধমকি করলে আপনি যারপরনাই প্রীত হন (হয়তো এমনও ভাবেন যে এতদিনে এমন একটা নেত্রী পেয়েছি যিনি মানুষের কথা ভাবেন) , শুধু এই প্রশ্ন কদাপি মনে জাগে না, যে, নিজের হাতে থাকা সরকারি হাসপাতালের উন্নতি না করে উনি বেসরকারিদের পেছনে পড়তে গেলেন কেন? সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভালো হলে বেসরকারি হাসপাতালে যাবার প্রবণতা আপনাআপনিই কমে যাবে , আর সত্যিই তা করা গেলে বেসরকারি হাসপাতালের বেপরোয়া বিল করার প্রবণতাও কমবে। তাহলে নিজের হাতে থাকা হাসপাতালগুলোর উন্নতি ঘটানোর মতো সহজ কাজটা মুখ্যমন্ত্রী করছেন না কেন?

চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে না গেলেও আপনি চান যে আপনার বাড়ির মেয়েটি বা ছেলেটি সরকারি মেডিকেল কলেজেই পড়ুক। পড়ুক, কিন্তু কিছুতেই যেন সে পলিটিক্সে না জড়ায়। সত্যিই তো! পলিটিক্স মাত্রেই খুব খারাপ জিনিস। মুখ্যমন্ত্রীও আপনার মনের কথা বোঝেন। তিনিও বললেন, ছাত্রছাত্রীরা কলেজে যায় লেখাপড়া করতে, সেখানে আবার রাজনীতি দলাদলি, ইউনিয়ন ইলেকশন এসব থাকবে কেন? অতএব, কলেজে কলেজে আর দলাদলি নেই, নির্বাচিত ছাত্রসংসদ নেই , রয়েছে বিশুদ্ধ লুম্পেন ও হুলিগ্যানদের রাজত্ব। রাজনীতি নেই, সংগঠিত বিরোধিতা নেই , সুতরাং দুষ্কৃতীদের অবাধ দাপাদাপি অনিবার্য (সংগঠিত বিরোধিতা নেই , আর সংগঠিত দুষ্কৃতিদের একক উদ্যোগে বিরোধিতা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট একক ব্যক্তির পরিণাম সহজেই অনুমেয়)। আপনি জানতেন না?

দুষ্কৃতি-শাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঠিক যেমনটি প্রত্যাশিত , ছাত্র-ভর্তি থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফলাফল , সর্বস্তরে অবাধ দাদাগিরি। এবং দুর্নীতি। মেডিকেল কলেজ সেই অর্থে সোনার ডিম পাড়া হাঁস। জেনারেল কলেজে অর্থোপার্জনের যতখানি সুযোগ, এখানে সেসব তো রয়েছেই , বাড়তি হিসেবে রয়েছে আস্ত একখানা হাসপাতাল এবং হাজারে হাজারে পেশেন্ট। সেরকম এলেমদার তৃণমূলী হলে ধুলোমুঠি সোনা করতে পারে , আর এ তো আস্ত একেকখানা মেডিকেল কলেজ! অসীম সম্ভাবনাময় সোনার খনি। এবং এব্যাপারে সন্দীপ ঘোষের ব্যতিক্রমী প্রতিভা ও উদ্ভাবনী মস্তিষ্কের কথা মাথায় রেখেও বলি, রাজ্যের

শাসকদলে অনুরূপ প্রতিভার কোনও অভাব নেই। এই যেমন ধরুন, সন্দীপবাবু জেলে যাবার পরে কি মেডিকেল কলেজগুলো বদলে গেছে? পাগলা দাশু অভিনীত সেই নাটকের চরিত্রের মতোই দুর্নীতি-তোলাবাজি-হুমকির অভিযোগে অভিযুক্ত কুশীলবরা, তৃণমূল-আশ্রিত ভিন্ন সংগঠনের নামে, আবার এসেছে ফিরিয়া। আরেকটা অভয়া ঠিক কবে ঘটবে নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, খাস কলকাতার ল-কলেজের ঘটনা থেকে আন্দাজ করা যায়, দিনটি খুব দূরে নয়।

তো যেকথা বলছিলাম, একেবারে মূক-বধির-অন্ধ না হলে, অভয়া-ঘটনার আগে অধি আপনি কিছুই জানতেন না, এমনটা বিশ্বাস করা যায় না।

শুধু সরকারি স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান বা মেডিকেল কলেজই বা কেন, সার্বিকভাবে ডাক্তারির দেখভালের দায়িত্বে থাকে মেডিকেল কাউন্সিল। ২০২২ সালে সেই মেডিকেল কাউন্সিল নির্বাচনে যে সীমাহীন জালিয়াতি হয়েছিল, সে খবরও কি আপনি রাখেননি? যাবতীয় সংবাদমাধ্যমে সে জালিয়াতির (এবং আমাদের প্রতিবাদের) খবর প্রকাশিত হয়েছিল , সর্বাধিক বিক্রীত বাংলা সংবাদপত্রে সে নিয়ে সম্পাদকীয় অধি লেখা হয়েছিল , আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করাতে চান যে সেসবের কিছুই আপনি জানতেন না? হ্যাঁ, ওই নির্বাচনের জালিয়াতির পাণ্ডা ছিল যারা , এবং সেই নির্বাচনে জিতে ডাক্তারির নৈতিকতা রক্ষার দায়ভার গ্রহণ করল যারা , অভয়ার ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ও হুমকি-সংস্কৃতির প্রসঙ্গে তাদেরই নাম বারবার সামনে এসেছে। ২০২২ সালে মেডিকেল কাউন্সিল নির্বাচনের দুর্নীতি নিয়ে আপনি যদি একটু প্রতিবাদ করতেন , আরেকটু সক্রিয়ভাবে আমাদের প্রতিবাদে সামিল হতেন , কে বলতে পারে, তাহলে হয়ত চিকিৎসক-দুষ্কৃতির দলটি একটু সাবধান হতো? হয়ত ২০২৪ সালে এমন মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটতেই পারত না?

আপনি নিশ্চিত জানেন, তবু আরেকবার মনে করিয়ে দিই , ২০২২ সালে জালিয়াতির মাধ্যমে নির্বাচিত সেই সদস্যরাই এখনও রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল চালাচ্ছে , অভয়ার খুন-ধর্ষণের ঘটনা ও প্রমাণ-লোপাটে অভিযুক্ত যারা, তারাই চিকিৎসার নৈতিকতার দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে , সেই দায়িত্বের অপব্যবহারের মাধ্যমে ঢালাও ভয়-দেখানো ও তোলাবাজিও চলছে। অভয়া-ঘটনার পরেও পার পেয়ে যাবার কল্যাণে তাদের ঔদ্ধত্য এতখানিই বেড়েছে যে তারা আদালতেরও তোয়াক্কা করছে না, জালিয়াতির তদন্তের কাজে তারা বাধা সৃষ্টি করছে এই মর্মে খাস কলকাতা হাইকোর্ট উষ্মা প্রকাশ করার পরেও তারা এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না।

অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। একটি অন্যায় করে পার পেয়ে যাওয়া পরবর্তী অন্যায়ের সাহস জোগায়। হয়তো অনুপ্রেরণাও জোগায়। মেডিকেল কলেজ তথা স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আমি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করলাম , নইলে কথাগুলো এই রাজ্যের বাকি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বিষয়ে প্রযোজ্য। এবং আপনি শাসকদলের পক্ষে রইলেন নাকি বিপক্ষে, তার উপর আপনার বা আপনার নিকটজনের নিরাপত্তা নির্ভর করে না। অভয়ার বাবা-মা তৃণমূল-বিরোধী ছিলেন বলে শুনিনি, অভয়াও সক্রিয় রাজনীতির মধ্যে ছিল না। ল-কলেজের ধর্ষিতা মেয়েটির বাবা এবং মেয়েটি স্বয়ং, দুজনেই সক্রিয়ভাবে তৃণমূল , তা সত্ত্বেও দলের এক 'সহযোদ্ধা'-র লালসার হাত থেকে বাঁচেনি।

শাসকদলের এক সম্ভাবনাময়ী নেত্রী জানিয়েছেন যে তিনিও একপ্রকার যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। হয়েছিলেন দলীয় সহযোদ্ধার হাতেই। এই স্বীকারোক্তির পরিণতি হিসেবে সেই তরুণীই বিস্তর কটূক্তি শুনছেন, দলের মধ্যেই একঘরে হয়ে গিয়েছেন , হেনস্থাকারীরা বুক ফুলিয়ে বাঁচছেন। সুতরাং, তাঁরা কার বা কাদের পাশে থাকছেন, সে বিষয়ে শাসকপক্ষের অবস্থান খুবই স্পষ্ট।

এমতাবস্থায় আপনার অবস্থানটিও স্পষ্ট হওয়া জরুরি। প্রতিবাদ না করা, মুখ বুঁজে সয়ে যাওয়া, এমনকি শাসকের পক্ষে থাকা , কোনোটিই নিরাপত্তার গ্যারান্টি নয়। অভয়ার সুবিচার পাওয়ার প্রশ্নটা আপনার-আমার সকলের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(গণশক্তির সৌজন্যে)